শিবরাম চক্রবর্তীর

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র, ১৩৬৩
এপ্রিল, ১৯৫৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ
শ্রাবণ, ১৩৬৬
জুলাই, ১৯৫৯
তৃতীয় মুদ্রণ
শ্রাবণ, ১৩৬৯
জুলাই, ১৯৬২

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
সমীর রায়চৌধুরী

ছেপেছেন
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৬

শিল্পী ও সাহিত্যিকের বন্ধু, কৃষ্টির পুরোহিত

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার

করকমলেষু—

হলধর আর ইন্দ্রসেন, ৭
গোখলে, গান্ধিজি এবং গোবিন্দবাবু, ২৩
এক দুর্যোগের রাতে, ৩১
নরখাদকের কবলে, ৪২
গুরুচণ্ডালী, ৫৪
কন্ধে-কাশির কাণ্ড, ৬০
Call-কারখানা, ৭৯
পদ্মাপাড়ি, ৮৭
বাজিরাও—অদ্বিতীয়, ৯২
জোড়াভরতের জীবন-কাহিনী, ১০৪

'শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প'র ভূমিকা লিখতে বসে বিশ বছর আগের বয়সে যেন ফিরে গেলাম। দুই ভাই এক বোন মাথা-ঠোকাঠুকি করে হুমড়ি খেয়ে একসঙ্গে শিবরামের 'মণ্টুর মাস্টার' পড়ছি। একসঙ্গে বই মনে মনে গোগ্রাসে পড়া। প্রথম জনের পাতা শেষ হলে বলত, 'উঁ?' অর্থাৎ তোমাদের কদ্দুর, দ্বিতীয় জনের হলে বলত, 'উঁ,'—অর্থাৎ আমরাও শেষ, তৃতীয় জন বলত 'উঁ,' মানে আমারও শেষ—পাতা ওল্টাতে পার। তারপর পাতা উল্টে দ্বিতীয় পাতায় আবার হুমড়ি খেয়ে পড়তাম। একজন শেষ করলে পরে অন্যজন পড়বে—এতটা ধৈর্য রক্ষা করতে পারতাম না।

হাসিয়ে মারতে ওস্তাদ অমন একজন লেখক বাংলা ভাষায় আর আমরা দ্বিতীয় পাইনি। 'মণ্টুর মাস্টার,' 'কলকাতার হালচাল', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'কালান্তক লালফিতা' (সেই পাঁঠা তো ?) 'ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি', 'হাতির সঙ্গে হাতাহাতি', 'কাকাবাবুর কাকাতুয়া'—নামের লিস্ট বাড়াব না—অজস্র বই পড়ে যেমন আমরা হেসেছি তেমনি কষ্টও কম পাইনি। ইস্কুলের টিফিনের চারটে পয়সা দিয়ে নেসল্‌স্ চকোলেট কিনে বন্ধুদের ঘুস দিতাম, 'বইটা ভাই আজ দে, কাল পড়ে ফিরিয়ে দেব।' পয়সা জমিয়ে জমিয়ে ছ-আনা করে 'যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন' কিনতে গিয়েছি—দোকানদার বলল আনিটা অচল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বলল—বইটা নিয়ে যাও পয়সাটা অন্য দিন দিয়ে যেয়ো। কতদিন যে ইস্কুলের বইএর ফাঁকে শিবরাম চক্রবর্তীর বই বেরিয়ে পড়ে যাওয়ায় বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে ক্লাশের শোভাবর্ধন করতে হয়েছে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু তাতে আমাদের দুঃখ ছিল না,—বাড়ি থেকে পালানো কাঞ্চন, কলকাতায় আসা হর্ষবর্ধন গোবর্ধন, আলেকজাণ্ডার, চালের আড়তের খাতিয়েকান্ত, চিঁহি-চিঁহি-ঘোড়া-হয়ে-যাওয়া বিশ্বপতিবাবু, এদের কথা না জানলে এদের মুখের মজার মজার কথা না শুনলে হয়ত গোমড়ামুখো রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকতাম। শিবরাম তোমাদের আমাদের সেই গোমড়ামুখো হবার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

ভূমিকা লিখতে হচ্ছে, কিন্তু ভূমিকা লিখব কী! হাসির গল্পের লেখকের নাম যদি শিবরাম চক্রবর্তী হয় তবে আর ভূমিকার দরকার পড়ে না। তবু নাকি ভূমিকা দেওয়া একটা দস্তুর এবং তা লেখকের নিজের লেখা হওয়া চাই।

কিন্তু শিবরাম নাছোড়বান্দা, বললেন, ভূমিকা কেন—সাতদিন কিছুই আমি লিখতে পারব না—শরীর ভীষণ খারাপ ; ডাক্তার খাটতে বারণ করে দিয়েছে সাতদিন—বলেছে—খেটেছ কি খাটেছ।

বললাম,—তার মানে ?

উনি বললেন,—'খাটেছ' মানে 'খাটে উঠেছ', আর ইহজীবনে তাহলে লিখতে হবে না।

তাঁর বাছাই-করা হাসির শ্রেষ্ঠ গল্প-সঙ্কলনের ভূমিকা এইখানেই শেষ করলাম।

১২ই চৈত্র, ১৩৬৩ কার্তিক মজুমদার

বাসে উঠেই হর্ষবর্ধন ভাবিত হন। ভাইকে ডেকে বলেন —"সনাতনখুড়ো বলেছিল সাহেবি দোকানে পাওয়া যায় জিনিসটা। কিন্তু সাহেবি দোকান কোথায় কে জানে!"

"খুড়োর আর কী, বলেই খালাস!" গোবর্ধন গরজায়—"এখন আমরা ঘুরে মরি সারা কলকাতা!"

হর্ষবর্ধন মুখভঙ্গী করেন—"কাকেই বা জিগগেস করি—কেই বা জানে!"

ওঁরা ছাড়া আরও একটি আরোহী ছিল বাসে, তিনি মহিলা। গোবর্ধন সেইদিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে: "ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না? মেয়েদের অজানা কী আছে?"

প্রস্তাবটা হৃদয়গ্রাহী হয় হর্ষবর্ধনের। "তুই জিজ্ঞাসা কর!"

"তুমিই কর দাদা!" গোবর্ধনের সাহসের অভাব।

"কী ভীতু রে!" তিনি ফিস-ফিস করেন—"কর না তুই, গোবরা! ভয় কী?"

"উঁহু!" গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে।

অগত্যা হর্ষবর্ধনকেই মরিয়া হতে হয়। অনেকবার হাত কচলে অবশেষে তিনি বলেই ফেললেন—"দেখুন, আমরা একটা মুস্কিলে পড়েছি"—সমস্যাটা তিনি প্রকাশ করেন মহিলাটির কাছে।

মহিলাটি জবাব দেন—"আপনারা হল অ্যাণ্ডারসনের দোকানে যান না কেন? আর কিছুদূর গেলেই তো—"

এই বলে তিনি বাসের কণ্ডাকটারকে ওঁদের যথাস্থানে নামিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে নেমে যান এলগিন রোডের মোড়ে।

বাসওয়ালা চৌরঙ্গীতে এক সাহেবি দোকানের সামনে ওঁদের নামিয়ে দেয়—"হলন্দর-সনকো দুকান এহি হ্যায় বাবুজি।"

তারপর হর্ন বাজিয়ে চলে যায় বাস।

বাড়িটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন,—"হ্যাঁ, এই দোকানই বটে। কী বলিস গোবরা?"

"ঠিক। সনাতনখুড়ো যেমন বলেছিল তার সঙ্গে মিলছে হুবহুব।" গোবর্ধনও ঘাড় নাড়তে কার্পণ্য করে না।

"পড়্ তো! পড়ে দ্যাখ্ তো, কী লিখেছে বড়-বড় ইংরিজিতে!"

গোবর্ধন বানান করে করে পড়ে মনে মনে। তারপর বলে—"বুঝেছ দাদা, এরা সব হল্যাণ্ডের। হল্যাণ্ড বলে একটা দেশ আছে জান না? ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ইসকট্ল্যাণ্ড—"

"যা যাঃ! তোকে আর ভূগোল ফলাতে হবে না! ভারি তো বিদ্যে! তাই আবার ইসকট্ল্যাণ্ড!" হর্ষবর্ধন ধমকে দ্যান—"কী পড়লি তাই বল্।"

"ঐ কথাই। হল্যাণ্ড আর তার ছেলেপুলে।" গোবর্ধন ব্যাখ্যা করতে চায়। "ঐ তো পষ্টই লিখে দিয়েছে। পড়েই দেখ না। হল্যাণ্ড—অ্যাণ্ড—অ্যাণ্ড মানে তো এবং? অ্যাণ্ড হার—হার মানে তো তার? হিজ—হার—মনে নেই? অ্যাণ্ড হার সন—এবং তার ছেলেপুলে।"

হর্ষবর্ধনের চোখ এবার স্বভাবতই কপালে উঠে। অ্যাঁ? এত বড় কথা লিখে দিয়েছে! কলকাতায় এসে কারবার করছে কিনা স্বয়ং হল্যাণ্ড? সঙ্গে আবার ছেলেপুলে নিয়ে? অবাক কাণ্ড!

হর্ষবর্ধনের চোখ ঘামাতে হয়, বাধ্য হয়েই। চোখ খাটাতে নিজেকে রাজি করা ওঁর পক্ষে সহজ নয়, কেননা একটু খাটালেই তাঁর চোখ টাটায়—চল্লিশের পর থেকেই এমনি। যাই হোক, বদন ব্যাদান করে আকর্ণ চক্ষুবিস্তার করার চেষ্টা পান তিনি।

নাঃ, অতটা ভয়াবহ কিছু নয়। ক্রমশ তাঁর হাঁ বুজে আসে—চোখও সংক্ষিপ্ত হয়।

"হার কই? হার?" উষ্ণ হয়ে উঠেন তিনি—"এইচ্ গেল কোথায়? হার সনের এইচ্—শুনি?" গোবরাকে তাঁর প্রহার করার ইচ্ছে হয়।

"পড়ে গেছে।" গোবর্ধন আমতা আমতা করে—"পড়ে যায়না কি?"

"তোর মাথা! পড়ে গেলেই হল? তক্ষুনি তুলে ধরে আবার লাগিয়ে দিত না তাহলে?" হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন—"ও-কথাই নয়! কথাটা হচ্ছে—হুম!"

দাদার আবিষ্কার অবগত হবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয় গোবর্ধন।

"কথাই হচ্ছে, আর কিছু না—হলধর আর ইন্দ্রসেন।" বলে গোঁফের ডগায় তিনি ডবল হস্তক্ষেপ করেন এবার।

"গোবর্ধন অবাক হয়ে যায়—"অত বড় লম্বাচৌড়া কথাটা হয়ে গেল হলধর আর ইন্দ্রসেন!"

"হবে না কেন?" হর্ষবর্ধন বলেন, "ইংরিজিতে বানান করতে গেলে তাই তো হবে। কলকাতা কেন ক্যালকাটা হয় তবে? ব্রহ্মদেশ কেন বার্মা হয় শুনি? গঙ্গা গ্যাঞ্জেস? ইংরিজিতে আমার নাম বানান করে ছাখ্ না, তাহলেই টের পাবি। করে ছাখ.

সে দুশ্চেষ্টা গোবর্ধন করে না—দুঃসাধ্য কাজে স্বভাবতই সে পরাঙ্মুখ, এবং পরমুখাপেক্ষী।

অগত্যা হর্ষবর্ধনই প্রয়াস পান—"আমার নামের বানান বড় সোজা নয় রে! অনেক মাথা ঘামিয়ে তবে বের করেছি। প্রথমে ধর, এইচ—ও—আর—এস—ই,—কী হল? হর্স। তারপরে হবে বি—আই—আর—ডি,—কী হল? বার্ড। তারপর ও—এন,—অন। হর্স-বার্ড-অন। হুম্।"

গোবর্ধনের বিস্ময় ধরে না। ওর দাদার প্রতিভা আছে, বাস্তবিক!

"মানেও কত বদলে গেল।" নিজের অর্থ নিজেকেই তাঁর খোলসা করতে হয়। "কোথায় আমি হর্ষবর্ধন, না কোথায় আমি ঘোড়ার উপরে পাখি! কিংবা পাখির উপরে ঘোড়া? ও একই কথা!"

মানেটা মনঃপূত হয় না গোবরার। ঘোড়ার সঙ্গে তার দাদার তুলনা—ছ্যাঃ! দাদাকে ইতর প্রাণীর আসন দান করতে কুণ্ঠা হয় তার।

সে বিরক্তি প্রকাশ করে—"কিন্তু যাই বল দাদা! ইংরিজি করলে নামের আর কোন পদার্থ থাকে না! হর্ষ কথাটার বাংলা মানে হল আনন্দ, আর ইংরিজি মানে কিনা ঘোড়া! ঘোড়ায় আর আনন্দে কত তফাত! ভাব তো একবার!"

গোবর্ধন একটা হাত আকাশে, আর একটা হাত পাতালে পাঠিয়ে যেন ব্যবধানটাকে পরিস্ফুট করতে চায়।

"কিছু তফাত নেই! ঘোড়ার পিঠে চেপেছিস কখনো? চাপলেই বুঝবি।" হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি হয়—"ঘোড়া আর আনন্দ এক।"

"হ্যাঁ, যদি পড়ে না যাও তবেই!" গোবর্ধন গোঁ ছাড়ে না।

"তোর যেমন কথা! আমি বুঝি পড়ে যাই কখনো? দেখেছে কেউ? তা আর বলতে হয় না!" ঘোড়ার সঙ্গে নিরানন্দের কোন ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনে কখনো হয়েছিল কি না হর্ষবর্ধন সে কথা ভুলে থাকতেই চান। "কিন্তু আমার ছবিটা কেমন হয় বল্ দেখি? একটা ঘোড়া, তার পিঠের ওপর একটা পাখি।' কিংবা একটা পাখি, তার পিঠে একটা ঘোড়া—সে যাই হোক।' কেমন, খাসা হয় না? চমৎকার!"

নিজের ছবির কল্পনায় নিজেই তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন তবু গোমড়া হয়ে থাকে—"এর চেয়ে তোমার সেই ছবিই ছিল ভাল।"

"কোন্ ছবি ?"

"সেই যে সেদিন একটা লোক মইয়ে উঠে আমাদের বাড়ির দেয়ালে সাঁটছিল—?"

"সেই কোন রাজা-মহারাজার ছবি ?" ভ্রূকুঞ্চিত করে বিস্মৃতির পঙ্কোদ্ধার করেন হর্ষবর্ধন—"না রে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কিংকং না কী !" গোবর্ধন সায় দ্যায়।

"এবার মনে পড়েছে।" হর্ষবর্ধন বলেন—"ওঃ। আমার সেই আরেক প্রতিমূর্তি—যা দেয়াল থেকে খুলে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে গিয়ে তোর বৌদিকে উপহার দেব বলেছিলাম ? সে-ছবি তো ভালই—" হর্ষবর্ধন বাক্যটাকে সজোরে শেষ করেন—"কিন্তু আমার এ-ছবিই বা এমন মন্দ কী।"

"কী জানি। গোবরা ঘাড় নাড়ে—"তোমার চারপেয়ে ছবি বৌদির পছন্দ হলে হয় !"

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন—"হ্যাঃ, তাই নিয়েই আমি মাথা ঘামাচ্ছি কিনা। তোর বৌদির মনের মত হবার জন্যে হাত-পা সব আমায় একে-একে ছেঁটে ফেলতে হবে আর কি।"

ঘোড়ার কথা ছেড়ে গোড়ার কথায় ফিরে আসে গোবর্ধন। "তা ইন্দ্রসেন না-হয় হল। কিন্তু 'ধর' কই ? 'ধর' ? হলধরের 'ধর' ?"

"চল্ চল্, আর বকতে হবে না তোকে। কেন, 'হল' তো ঐ রয়েছে। মাথা থাকলেই হল, 'ধর' নিয়ে কী হবে ?"

হর্ষবর্ধনের পদক্ষেপ শুরু হয়। গোবর্ধন আর বাক্যব্যয় করে না।

দোকানের ভেতরে ঢুকতেই এক বাঙালী কর্মচারী এগিয়ে আসে—"কী চাই আপনার ?"

"আমার কিছু চাই না।" হর্ষবর্ধন বলেন—"আমাদের দেশের সনাতনখুড়ো—তারই একটা চাই জিনিস, তার জন্যেই কিনতে আসা"

"কী জিনিস বলুন।"

"আপনাদের এই হলধরের দোকান থেকে অনেকদিন আগে একটা মাখন-তোলার কল তিনি কিনে নিয়ে গেছলেন। আমাদের সনাতনখুড়ো। সেই কলের, মশাই, একটা খুরি গেছে হারিয়ে। সেই কলে লাগানো থাকতো সেই খুরি—সেই খুরিটা চাই।"

"মাখন-কলের খুরি? কী রকম বুঝিয়ে দিন তো?"

"আমি কি আর দেখতে গেছি? হারিয়েই গেল, তার আর দেখলাম কখন!"

গোবর্ধন যোগ ছায়—"কীরকম আর? এই, খুরি যেমন হয়।" বাকবিতণ্ডা দেখে এক সাহেব সেলস্‌ম্যান এসে দাঁড়ায়—"হোয়াট বাবু?"

বহুদিন থেকেই হর্ষবর্ধনের এই বাসনা ছিল নিজের ইংরিজি বিদ্যার বহর কোথাও জাহির করেন—এখন অযাচিতভাবেই সেই আকস্মিক যোগ যেন আবির্ভূত হয় তাঁর জীবনে।

তিনি আর কালবিলম্ব করেন না—"ইয়েস সার ইয়েস—উই ওয়াণ্ট—উই ওয়াণ্ট এ খুরি—"

"খুরি—হোয়াট?"

"ইয়েস, খুরি খুরি, সার!"

"খুরি?" দি স্পেল? সাহেব প্রশ্ন করে।

"হোয়াট সার?" হর্ষবর্ধনের বোধগম্যতার বাইরে পড়ে প্রশ্নটা।

"বানান করতে বলেছে।" বাঙালী বাবুটি বুঝিয়ে দেয়।

"ও! বানান? খুরি—খ-য়ে হ্রস্ব-উ—"

"উঁহুহু!" গোবর্ধন বাধা দেয়—"ইংরিজি বানান। বাংলা কি বুঝবে সাহেব?"

"ও। ইংরিজি? খুরি—কে-এইচ-ইউ-আর আই—।"

" 'আই'—তুমি ঠিক জান? 'ওয়াই'-ও তো হতে পারে?" গোবর্ধন ফিসফিসায় কানের কাছে।

"পাগল। 'ওয়াই' হয় কখনো? বি-এল-এ ব্লে, বি-এল-ই ব্লি, বি-এল-আই ব্লাই। তারপর বি-এল-ও ব্লো, বি-এল-ইউ ব্লিউ, আর—বি-এল-ওয়াই ব্লোয়াই।"

"তাহলে খুরি করতে তুমি খুরাই করছ যে।"

"তাই নাকি? তাই তো।" হর্ষবর্ধন আকাশ থেকে পড়েন। "নো সার নট 'আই'—" তিনি তৎক্ষণাৎ 'ভ্রম-সংশোধন' যোগ করেন—"বাট 'ই'—ওনলি 'ই', সার।"

বানানটা মনে মনে আন্দোলন করে সাহেব বাঙালী কর্মচারিটিকে উদ্দেশ করে বলে—"ব্রিং দি চেম্বার্স, বাবু।"

চেম্বার্স আনীত হলে সাহেব পটাপট পাতা উলটে যায়। ক্রমশ সাহেবের কপালে রেখা পড়ে, ভুরু কুঁচকোয়, নাক সিঁটকোয়—সারা মুখ বিকৃত হয় অবশেষে; খুরির কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় না।

গোবর্ধন মন্তব্য করে—"বাব্বাঃ। কী মোটা বই একটা। বোধহয় ইংরিজি মহাভারত।"

"মহাভারত নয়, অভিধান।" কেরানিবাবুটি বলে।

"ড্যাম ইওর খুরি।" সাহেব ঝাঁঝিয়ে ওঠে,—"ব্রিং অক্স-ফোর্ড।"

ইতিমধ্যে এক মেম-সেল্‌স্‌ম্যান এসে কি এক জরুরি কথা বলে, সাহেব তার সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের অন্য ধারে চলে যায়। বেয়ারাকে হাঁক দিয়ে যায়—"চেম্বারমে লে যাও।"

"বাবা, কী আওয়াজ।" গোবর্ধনের পিলে চমকায়।

"হবে না কেন? গোরু খায় যে। গোরুর আওয়াজটা কি কম?—হাম্—"

গো-ডাকের গোড়াতেই দাদার মুখ চেপে ধরে গোবর্ধন। "করছ কী! ধরে নিয়ে যাবে যে!"

"হুঁঃ! নিয়ে গেলেই হল!" হর্ষবর্ধন বুক ফোলান—"মাইরি আর কী!"

"ভুল করে গোরু মনে করে ধরতে পারে তো? তখন খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ?"

বেয়ারা এসে ওদের ডাকে—"চলিয়ে, চেম্বারমে চলিয়ে।"

সাদর অভ্যর্থনায় হর্ষবর্ধন আপ্যায়িত হয়ে এগিয়ে চলেন।

যেতে যেতে গোবর্ধন কিন্তু কানাঘুসো করে—আশঙ্কা অব্যক্ত রাখা অসম্ভব হয় ওর পক্ষে—"আমাদের অভিধানের মধ্যে নিয়ে ঢুকিয়ে দেবে নাকি দাদা?"

"হ্যাঃ! ঢোকালেই হল!" হর্ষবর্ধন ভড়কাবার ছেলে নন—"কেমন করে ঢোকায় দেখাই যাক না একবার! এত বড় মানুষটাকে চেম্বারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে—অত সোজা না! আমরা কি জলছবি—যে লাগিয়ে দিতেই অভিধানের গায়ে সেঁটে যাব অমনি?"

ভাইকে অভয় দেবার জন্যে, গটমট করে চলতে চলতেই তাঁকে বুকের ছাতি ফোলাতে হয় অতি কষ্টে।

ওঁদের দুজনকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দ্যায় বেয়ারা—"আভি বড়া সাহাব চেম্বারমে বাত করতেঁ হেঁ। আপলোগ হিঁয়া বৈঠিয়ে। কল হোনে সে হাম তুরন্ত লে যায়ঙ্গে।"

"কলের মধ্যে নিয়ে পিষে ফেলবে না তো দাদা?" গোবর্ধন আবার ঘাবড়ায়।

"হ্যাঃ! পিষলেই হল!" অনুচ্চ কণ্ঠে যতটা সম্ভব পরাক্রম প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কলের কথায় উনিও যে বেশ বিকল হয়ে এসেছেন, ওঁর ভাবান্তর থেকে সেটা বুঝতে দেরি হয় না।

"হ্যাঃ, পিষলেই হল! আমরা ঢুকতে যাব কেন কলে?

আমরা কি ইঁদুর? ইঁদুররাই কেবল বোকার মত ঢোকে কলের মধ্যে।"

মুখে সাপট দেন বটে, কিন্তু বেয়ারার ভাবভঙ্গী ক্রমশই যেন ওঁর কেমন-কেমন ঠেকে। গোবর্ধনের কাপৌরুষ ওঁর মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে। সনাতনখুড়োর খুরির খোঁজ না করতে এলেই যেন ভাল হত, কেবলি ওঁর মনে হয়। মনে মনে সনাতনের মুণ্ডপাত করেন ওঁরা।

এমন সময়ে সেই মেমটি বড়-সাহেবের খাসকামরা থেকে বেরিয়ে আসে।

"হোয়াট আর ইউ ডুয়িং হিয়ার বাবু?"

হর্ষবর্ধন তটস্থ হয়ে ওঠেন,—"ইয়েস সার!"

"ডোণ্ট সার মি! সে—ম্যাডাম।"

"ইয়েস সার!" পুনরুক্তির কোথায় ত্রুটি ঘটেছে হর্ষবর্ধন বুঝতে পারেন না—ভারি বিব্রত হন। মেমটা এবার দাবড়ি ছায়—"সে—ম্যাডাম!"

—"ইয়েস ড্যাম।"

"হু দি ডেভিল ইউ!"

মেমটা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

"তুমি ড্যাম বললে কিনা, মেমটা চটে গেল তাই তো।" গোবর্ধন উল্লেখ করে।

"হ্যাঁ, আমি ওকে মা বলতে যাই আরকি!" হর্ষবর্ধন ঈষদুষ্ণই হন—"আমার বাবা কি ওকে বিয়ে করতে গেছে সাতপুরুষে!"

"মা কেন? ম্যা তো। বললেই পারতে!"

"মা-ও যা ম্যা-ও তাই—একই মানে।" হর্ষবর্ধন টীকা করেন—"আমাদের ভাষায় যাকে মা বলি, ওদের ভাষায় তাকেই বলে ম্যা।"

গোবরা আপত্তি করতে যায়, কিন্তু ওর কথায় কান দ্যান না হর্ষবর্ধন।

"ইংরিজির তুই কী জানিস? তুই শেখাবি আমাকে? আমাকে আর শেখাতে হয় না ইংরিজি!"

"কিন্তু চটে গেল তো মেমটা।" গোবর্ধন তথাপি কিন্তু-কিন্তু।

"বয়েই গেল আমার! মেয়ে-ইংরেজ দেখে ভয় খাইনে আমি! আমি কি তোর মত কাপুরুষ?" বীর বিক্রমে ভাইকে বিধ্বস্ত করে দ্যান তিনি।

"ছাগলরাও তো ম্যা বলে। তুমি কি বলতে চাও যে ছাগলরাও তাহলে ইংরেজ?" বেশ গুরু-গম্ভীর মুখেই গোবর্ধনের প্রশ্ন হয়।

"বেড়ালেও তো ম্যাও বলে, তবে কি তুই বলছিস যে বেড়ালরা সব ছাগল?" হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না—"যদি আমার মত অনেক ভাষা তুই জানতিস তাহলে আর একথা বলতিস না। ইতর প্রাণীদের ভাষার মধ্যে ওরকম মিল প্রায়ই থাকে। না থেকে পারে না।" ভায়ের বোধোদয়ের জন্যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে দ্বিধা হয় না তাঁর।

অনেক ভাষা না জেনেও ক্ষোভ যায় না গোবর্ধনের। সে খুঁত-খুঁত করে তবুও—"ছাগলের ভাষায় আর ইংরেজের ভাষায় তোমার কিন্তু মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি দাদা; ছাগলের ভাষা শিখতে দেরি লাগে না, ইস্কুলে না গেলেও চলে; কিন্তু ইংরেজের ভাষা শেখা শক্ত কত!"

"শক্ত না ছাই! তোর মত ছাগলের কাছেই শক্ত!" হর্ষবর্ধন গোঁফ চুমরে নেন—"আমার কাছে জল!"

এবার গোবর্ধন চটে। বলে বসে—"তাহলে বল দেখি খুরির ইংরিজি?"

"কেন, বানান তো করেছি! কে এইচ ইউ—"

"বানান করা আর ইংরিজি করা এক হল ?"

"পারব না নাকি ইংরিজি করতে ? পারব না বুঝি ?" হর্ষবর্ধন কথা চিবুতে শুরু করেন—"এমন কী শক্ত কথা শুনি ? এক্ষুনি করে দিচ্ছি।" হর্ষবর্ধন স্মৃতির ক্ষেত্র চষে ফেলতে থাকেন—সেই কৃষিকার্যের দাগ পড়তে থাকে তাঁর কপালে। দারুণ পরিশ্রমে তিনি ঘেমে ওঠেন।

গোবর্ধন গুম হয়ে দাদাকে লক্ষ্য করে।

নিতান্তই মুষড়ে এসেছেন, এমন সময় এক আইডিয়া আসে তাঁর মাথায়—ডুবন্ত লোকে যেমন কুটো খুঁজে পায়। ডুবন্ত লোকেরাই পায়, পাওয়াই দস্তুর,—ডুবন্তরা আর কুটোরা প্রায় কাছাকাছি থাকে কিনা! কুটোর জন্যেই তো ডোবা, তাও না পেলে কে আর কষ্ট করে ডুবতে যাবে বলো ?

"পেয়েছি! পেয়েছি ইংরিজি!" হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন।

"কী, শুনি ?" গোবর্ধন সন্দেহের হাসি হাসে।

"পেয়েছি! মানে, আরেকটু হলেই পেয়ে যাই!" হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন,—"মানুষের পিঠে সেই যে কী হয় বল্ দেখি তুই, তাহলে এক্ষুনি আমি বলে দিচ্ছি।"

বিরাট আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে বৈজ্ঞানিকের ভাবভঙ্গী যেমন হয়,—হর্ষবর্ধনের চোখ-মুখের এখন সেই অবস্থা—"বল না কী হয় পিঠে ?"

"পিঠে তো চুল হয় না।" গোবর্ধন ঘাড় চুলকোয়—"কারু-কারু বুকে হতে দেখেছি অবিশ্যি।"

"যা হয় না আমি কি তাই জিগগেস করেছি ?" হুমকি দেয় হর্ষবর্ধন।

"পিঠে তবে কী হয় ? শিরদাঁড়া ?"

"সে তো হয়েই আছে। আবার হবে কী ?" ভারি বিরক্ত

হন তিনি—"আহা সেই যে—যা হলে কেটে বাদ দিতে হয়, তবেই মানুষ বাঁচে। আবার প্রায়ই বাঁচে না।"

"কুঁজ নাকি দাদা ?"

"তোর মাথা। বাবা কি আর সাধে নাম দিয়েছিল গোবর্ধন। কেবল গোবর—"

"—কেন, কুঁজই তো হয় পিঠে। কুঁজ ছাড়া আর কী হবে ? তুমি কি বলতে চাও তবে গোদ ? না, গলগণ্ড ?"

"আহা, সেই যে সনাতনখুড়োর যা হয়েছিল একবার। জেলার ডাক্তার এসে অপারেশন করল শেষে ?"

"ও। কার্বাঙ্কল ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কার্বাঙ্কল। এইবার পাওয়া গেছে।" হর্ষবর্ধনের মুখ যেন হাসিখুশির একখানা পৃষ্ঠা হয়ে যায়—"কার্বাঙ্কল থেকে এল আঙ্কল। আঙ্কল মানে খুড়ো—তাহলে খুড়ি মানে কী ? বল্ তো।"

"আমি কী জানি।" গোবর্ধন ঠোঁট ওলটায়—"তুমিই তো বলবে।"

"আহা, আমিই তো বলব। তুই বলবি কোত্থেকে ? তোর কি বিদ্যে আছে অত ? তাহলে ঘোড়ার পিঠে পা না বসে গাধার পিঠেই গিয়ে বসত। নামই পালটে যেত তোর। খুরির ইংরিজি ?—" মৃদু মধুর হাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল ভরে যায়—"খুরির ইংরিজি হল আণ্ট। আণ্ট মানে খুরি।"

"জানতাম। তোমার আগেই জানতাম।" মুখ বাঁকায় গোবর্ধন। "আবার আণ্ট মানে পিঁপড়েও হয়।"

"হয়ই তো।" হর্ষবর্ধন জোরালো গলায় জাহির করেন। "আণ্ট তো দু'রকমের—এক, পিঁপড়েরা, আর এক, খুড়ি-জেঠি। আমি বললুম বলেই জানলি, নইলে আর জানতে হত না তোকে। আমার জানা আছে।"

গোবর্ধন অনেকটা কাহিল হয়ে আসে—"আচ্ছা বেশ, আণ্ট বানান কর দেখি!"

"কেন? সোজাই তো বানান। এ-এন-টি—আণ্ট। 'এ'-তে 'অ'-ও হয় 'আ'-ও হয়। ইংরিজির মজাই ঐ!" মুরুব্বি চালে উনি মাথা চালেন।

"আবার 'এ'-ও হয়।" গোবর্ধন অনুযোগ করে। দাদার অগ্রগতির ধাক্কা সামলানো ওর পক্ষে শক্ত, তবু খুব বেশি পিছিয়ে থাকতেও রাজি নয় ও।

"আচ্ছা, সে তো হল। খুরি তো পাওয়া গেল। এখন মাখন-কলের ইংরিজি পেলেই তো হয়ে যায়—সাহেবকে বুঝিয়ে খুঁজে বার করাই জিনিসটা।" হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন—"জানিস ওর ইংরিজি?"

"মাখন-কল? কলের ইংরিজি তো মিল। যেমন, পেপার মিল—"

হর্ষবর্ধন উৎসাহ পান—"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। সেই যে একবার কোন্ পেপার মিল একরকমের কাঠের খোঁজ করেছিল আমাদের কাছে?"

"হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে।" গোবর্ধন সায় দ্যায়—"আর মাখন? মাখন হচ্ছে বাটার—জানোই তো তুমি। বাট—বাটার—বাটেস্ট। বাট মানে হল—কিন্তু, বাটার মানে—মাখন—আর বাটেস্ট? বাটেস্ট মানে?"

বিদ্যার পরিচয় দেবার মুখেই হোঁচট খেতে হয় গোবরাকে।

"বাটেস্টে কী কাজ আমাদের? বাটারই যথেষ্ট।" হর্ষবর্ধন বলেন—"তাহলে মাখন-কল মানে হল, বাটার-মিল। কেমন তো?"

দাদাকে পরামর্শ দেবার সুযোগ পেয়ে গোবর্ধন যেন গলে যায়: "মিল আবার কবিতারও হয় দাদা!" সে বলে—"তবে কবিতার কলকারখানা হল আলাদা।"

"তুই বড্ড বাজে বকিস গোবরা।" হর্ষবর্ধন একটু বিরক্তই হন—"তাহলে কী দাঁড়াল? তাহলে সাহেবকে গিয়ে এই কথা বলা যাক—কেমন?"

এমন সময় বেয়ারাটা আবার আসে—"চলিয়ে চেম্বারমে বড়া সাবকো পাস।"

দুরু-দুরু বক্ষে দু'ভাই আপিস-ঘরে ঢোকে। অভিধানের মতই প্রকাণ্ড বটে ঘরটা, তবে ততটা ভয়াবহ নয়। দুজনে গিয়ে দাঁড়ায় টেবিলের কাছে।

"হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট বাবু?"—প্রশ্ন এবং চুরুটের ধোঁয়া প্রকাণ্ড এক লাল মুখের দু'পাশ দিয়ে একই সময়ে এক সঙ্গে বহির্গত হয়।

হর্ষবর্ধন সাহস সঞ্চয় করেন—"উই ওয়াণ্ট ইওর আণ্ট"—

হর্ষবর্ধনের বাক্য শেষ হতে পায় না, সাহেবের চুরুট চমকে ওঠে মাঝখানেই—"হোয়াট?"

হর্ষবর্ধন একটু জোর পান এবার—"উই ওয়াণ্ট ইওর আণ্ট অফ এ বাটার-মিল।"

"ইল ওয়াণ্ট মাই আণ্ট?" গোল চোখ আরও গোলাকার হয়ে আসে সাহেবের—"ইজ দ্যাট সো?"

গোবর্ধন জবাব দেয়—"ইয়েস—সার।" কম্পিত কণ্ঠ ওর।

সাহেবের মুখ থেকে চুরুট পড়ে যায়, এবং দাঁত কড়মড় করে। কোট খুলে টেবিলের উপর ফেলে দ্যায়—আস্তিন গুটোয় সে—মাংসপেশীবহুল বিরাট হাত বিরাটতর বদ্ধমুষ্টিতে পরিণত হতে থাকে।

এই বদ্ধমুষ্টি অকস্মাৎ হয়ত ওদের নাকের সম্মুখীন হতে পারে, কেন জানি না এই রকম একটা ক্ষীণ আশঙ্কা হতে থাকে গোবরার।

প্রায় তাই—

"ওরে দাদারে—!"

দুর্ঘটনার পূর্বমুহূর্তেই গোবর্ধন দাদাকে জাপটে ধরে উদ্যত মুষ্টিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ঊর্ধ্বশ্বাস হয়। বেরুবার মুখে মেমের পা মাড়িয়ে দ্যায়, বেয়ারার সঙ্গে কলিশন বাধে, ধাক্কা লেগে একটা শো-কেস যায় উল্টে, বাঙালী বাবুটি ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্ট হয়ে কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ে কে জানে।—এসব দিকে ভ্রূক্ষেপের অবসর কোথায় তখন? একেবারে চৌমাথায় গিয়ে হাঁপ ছাড়েন ওঁরা।

"বাববাঃ! খুব বেঁচেছি!"

"আরেকটু হলেই—হুঁ!" হাঁপাতে থাকেন হর্ষবর্ধন।

"বাজার করা সোজা নয় কলকেতায়!" গোবর্ধন বলে—"বুঝলে দাদা?"

"সনাতনখুড়োর যেমন কাণ্ড!" হর্ষবর্ধন বেজায় রুষ্ট হন—"কলকেতায় খুরি কিনতে পাঠিয়েছে! খুরিদের জন্যে প্রাণে মারা পড়ি আর-কি!"

"একটা বিয়ে করলেই তো পারে বাপু!" দারুণ অসন্তোষে গোবর্ধনও তেতে ওঠে—"খুরির দুঃখ আর থাকে না! মাখনকলেও লাগিয়ে রাখতে পারে দিনরাত!"

"যা বলেছিস গোবরা!" হর্ষবর্ধন ভায়ের তারিফ করেন—"একটা কথার মত কথা বলেছিস এতক্ষণে!"

"হ্যাঁ, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! একটা সনাতন-খুড়ি হয়!"

"আমি শুধু ভাবছি, ব্যাটারা খুরি বোঝে না, আণ্টও বোঝে না—কী আশ্চর্য! এই বিদ্যে নিয়ে হল্যাণ্ড থেকে ব্যবসা করতে এসেছে হেথায়! আশ্চর্য!" হর্ষবর্ধন ক্রমশই বেশি অবাক হন—"কী করে যে এরা দোকান চালায় খোদাই জানেন! যে

লালমুখোটা প্রথমে এগিয়ে এল সেটা তো আস্ত একটা আকাট। খুরি বানান করে দিলুম, তবু বুঝতে পারে না।"

"একেবারে হলধর!"

"হ্যাঁ, সেইটেই হলধর। ঠিক বলেছিস তুই!" হর্ষবর্ধন ভাইয়ের কথাই মেনে নেন—অম্লান বদনেই।

"আর যেটা অভিধানের মধ্যে ঢুকে বসে আছে,—মুখ গোঁজ করে, ঘুসি পাকিয়ে—"

ধীরে ধীরে রহস্যকে বিস্তারিত করেন তিনি :

"—সেই ব্যাটাই হল—ইন্দ্রসেন। আসল ইন্দ্রসেন।"

গোখলে, গান্ধিজি এবং গোবিন্দবাবু

মহাত্মা বলে সর্বসাধারণে পরিচিত ও পূজিত হবার ঢের আগে থেকেই গান্ধিজি যে যথার্থ মহান্ আত্মা, তার সত্যিকারের পরিচয় এই গল্পে তোমরা পাবে। যিনি এই গল্পের গৌণ নায়ক তাঁব নিজের মুখ থেকে এ কাহিনীটি আমার শোনা।

গোবিন্দবাবু সেই সময়ে কলকাতার একজন সাধারণ অবস্থার কর্মচারী। তাঁর আসল নাম অবশ্য গোপন রাখলুম। এখন তিনি এমন বড় পদে প্রতিষ্ঠিত যে তাঁর নাম করলে অনেকেই তাঁকে চিনতে পাববেন।

বহু দিন আগেকার কথা। গোখলে সেই সময়ে ভারতবর্ষের নেতা। সেই গোখলের কলকাতা-বাসের সময়ে তাঁকে পছন্দসই বাসা খুঁজে দিয়েছিলেন, এই সূত্রে গোখলের সঙ্গে আমাদের গোবিন্দবাবুর ঘনিষ্ঠতা দাঁড়ায়।

ঘনিষ্ঠতা দিন-দিনই দারুণ থেকে দারুণতর হয়ে উঠেছিল। কেননা, গোখলের দেশ থেকে যখনই তাঁর আত্মীয়-গোষ্ঠীর কেউ আসেন, গোখলে তাঁকে কলকাতা দেখাবার ভার গোবিন্দবাবুর ওপর দেন। গোবিন্দবাবুকে গোখলের অনুরোধ রাখতে হয়। অত বড় দেশমান্য ব্যক্তির ভাড়াটে বাড়ি জোগাড় করে দেবার সুযোগ লাভ করে তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছিলেন, এখন তাঁর দেশোয়ালিদের কলকাতা দেখিয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

তাঁর ফরমাস খাটতে পেলে গোবিন্দবাবু যে আপ্যায়িত হন এটা বোধকরি গোখলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই গোবিন্দবাবুকে বাধিত করবার সামান্য সুযোগও তিনি অবহেলা করতেন না। যখনই পোরবন্দর, কি পুনা, কি ভুসাওয়াল থেকে কোন অতিথি

আসত, গোখলে বলতেন, "গোবিন্ বাবু, ইন্‌কো কলকাত্তা তো দেখ্‌লা দিজিয়ে।"

গোবিন্দবাবু অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ঘাড় নাড়তেন। কিন্তু সেই অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত অভ্যাগতকে কলকাতার দৃশ্য ও দ্রষ্টব্য দেখিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সেই উৎসাহের কতখানি পরে বজায় থাকত তা বলা কঠিন।

সেই সময়ে গান্ধিজি আফ্রিকা থেকে সবে স্বদেশে ফিরেছেন, তাঁর কীর্তিকাহিনী সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। যদিও আপামর সাধারণের কাছে তাঁর নাম তখনো পৌঁছোয় নি, তবুও তাঁর অদ্ভুত চরিত্র, জীবনযাত্রা ও কর্মপ্রণালীর কথা ক্রমশ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভারতবর্ষে ফিরেই গান্ধিজি গুজরাট থেকে কলকাতায় এলেন গোখলের সঙ্গে দেখা করতে।

সেই তাঁর প্রথম কলকাতায় আসা। কাজেই গোখলের স্বভাবতই ইচ্ছা হল গান্ধিজিকে কলকাতাটা দেখানোর। এ কাজের ভার আর কার ওপর তিনি দেবেন? এই কাজের উপযুক্ত আর কে আছে গোবিন্দবাবু ছাড়া? অতএব 'গোবিন্‌বাবুকে' ডেকে অনুরোধ করতে তাঁর বিলম্ব হল না।

"মোহনদাসকো কলকাত্তা তো দেখলা দিজিয়ে"—শুনে গোবিন্দবাবু কিন্তু নিজেকে এবার অনুগৃহীত মনে করতে পারলেন না। গান্ধিজির পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। যদিও গোবিন্দবাবুর কানে গান্ধিজির খ্যাতি পৌঁছেছিল, তবু কেবল 'মোহনদাস' থেকে তিনি বুঝতে পারলেন না যে তিনি সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটিরই 'গাইড' হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তা ছাড়া গোখলের কথায় তিনিই সকালে গিয়ে লোকটাকে স্টেশন থেকে এনেছেন—থার্ড ক্লাসের যাত্রী, পরনে মোটা গড়া—তাও আবার আধময়লা, পায়ে জুতো নেই, মলিন অপরিচ্ছন্ন চেহারা—এ সব

দেখে লোকটার ওপর তাঁর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় নি। সেই লোকটা-কেই সঙ্গে নিয়ে সারা কলকাতা ঘুরতে হবে ভেবে গোবিন্দবাবু উৎসাহ পেলেন না।

কিন্তু কী করবেন? গোখলের অনুরোধ! আগের দিনই তিনি গোখলের দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়কে কলকাতা দর্শন করিয়েছিলেন। সে লোকটি গুজরাটের কোন এক তালুকের দারোগা। সে তবু কিছু সভ্য-ভব্য ছিল, হাজার হোক দারোগা তো। কিন্তু এ লোকটা—? গান্ধিজির দিকে দৃষ্টিপাত করে গোবিন্দবাবু বিরক্তি গোপন করতে পারলেন না। বোধহয় কোন সিপাই-টিপাই কি দারোয়ানই হবে! গোখলের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু—তাঁর প্রদেশের সমস্ত লোকের ওপর গোবিন্দবাবু বেজায় চটে গেলেন। তাদের কলকাতা আসার প্রবৃত্তিকে তিনি কিছুতেই মার্জনা করতে পারছিলেন না।

যাহোক, নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে সিপাইকে লেজে বেঁধে গোবিন্দবাবু নগরে-ভ্রমণে বার হলেন। এই ভেবে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন যে, রাস্তার লোকে এও তো ভেবে নিতে পারে যে এ তাঁর নিজেরই সেপাই। 'গোবিন্দবাবু আজ বডিগার্ড সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন'—তাদের এই সাময়িক ভুল-বোঝার ওপর কথঞ্চিৎ ভরসা করে তিনি কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ পাবার চেষ্টা করলেন।

পরেশনাথ মন্দিরের কারুকার্য, সেখানকার মাছের লাল নীল ইত্যাদি রং-বেরং হবার রহস্য, মনুমেণ্ট কেন এত উঁচু হয়, কলকাতার গঙ্গা কোন্ কোন্ প্রদেশ পেরিয়ে এসেছে, হাওড়া-পুল কেন জলের ভাসে তার বৈজ্ঞানিক কারণ ইত্যাদি কলকাতা শহরে যা কিছু দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য ছিল লোকটাকে তিনি ভাল করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

ওকে ক্রমশই তাঁর ভাল লাগছিল। এমন সমঝদার শ্রোতা তিনি বহুদিন পাননি। এমনকি কালকের সেই দারোগাটিও তবু

মাঝে-মাঝে প্রতিবাদ করার প্রয়াস পেয়েছে—বলেছে অত :তা মনুমেণ্ট কেবল ইটের বাজে খরচ, মানুষ যদি না থাকল তো অ উঁচু করে লাভ কী। বলেছে মাছের ঐ লাল নীল রং সত্যিকার নয়, বাত্রে লুকিয়ে রং লাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই সিপাইটি সেরকম নয়; তিনি যা বলেন তাতেই ঘাড় নেড়ে এ সায় দেয়। তবে অসুবিধের কথা এই যে, কালকের দারোগাটি তবু কিছু ইংরিজি বুঝত, ইংবিজির সাহায্যে তাকে বোঝানো সহজ ছিল, কিন্তু এ সেপাই তো ইংরিজির এক বিসর্গও বুঝবে না! অথচ হিন্দিতে সমস্ত বিষয় বিশদ করিতে গিয়ে গোবিন্দবাবুব এবং হিন্দি ভাষার প্রাণান্ত হচ্ছিল।

গোবিন্দবাবু সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়লেন মিউজিয়মে গিয়ে। চিড়িয়াখানায় তেমন কিছু দুর্ঘটনা হয় নি, কেননা জন্তু-জানোয়ারের অধিকাংশই উভয়ের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল নয়। "ই হাঁথি, ই ভালু, ই বান্দর"—এই বলে তাদের পরিচিত করার পরিশ্রম গোবিন্দবাবুকে করতে হয়নি। কিন্তু মিউজিয়মে গিয়ে বাঁদরের পূর্বপুরুষ থেকে কী করে ক্রমশ মানুষ দাঁড়াল তার বিভিন্ন জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ডারুইনের বিবর্তন-বাদ বোঝাতে গোবিন্দবাবুর দাঁত ভাঙবার জোগাড় হল। কিন্তু সেপাইটির ধৈর্য ও জ্ঞান-তৃষ্ণা আশ্চর্য বলতে হবে। গোবিন্দবাবু যা বলেন তাতেই সে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, আর বলে—"সমঝাতা হ্যায়।"

সমস্ত দিন কলকাতা শহর আর হিন্দি বাতের সঙ্গে রেষারেষি করে গোবিন্দবাবু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে ছ্যাকরা গাড়ির সাহায্য নিলেও অধিকাংশ পথ তাঁদের হেঁটেই মারতে হয়েছিল। ফিরবার পথে গোবিন্দবাবু স্থির করলেন আর হাঁটা নয়, এবার সোজা ট্রামে বাড়ি ফিরবেন। সারাদিনের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে গোবিন্দবাবু কাবু হয়ে পড়লেও সেপাইটির কিছুমাত্র ক্লান্তি দেখা গেল না।

দেশ্ব-বাহন ছেড়ে কলকাতায় তখন প্রথম বিদ্যুৎ-বাহন ট্রাম
ছে। গোবিন্দবাবু ট্রামে উঠলেন বটে, কিন্তু সেপাইটি তাঁর পাশে
উ, এটা তাঁর অভিরুচি ছিল না। যদি চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে
বাৎ চোখাচোখি হয়ে যায়! কিন্তু সেপাইটির যদি কিছু কাণ্ডজ্ঞান
থাকে! সে অম্লানবদনে কিনা তাঁর পাশেই বসল! তার
আস্পর্ধা দেখে গোবিন্দবাবু মনে মনে বিরক্ত হলেন এবং
সঙ্কল্প করলেন আর কখনও গোখলের বাড়ির ছায়া মাড়াবেন
না।

তাঁদের মুখোমুখি আসনে একজন ফিরিঙ্গি বসে ছিল, তার
কি খেয়াল হল, সে হঠাৎ গোবিন্দবাবু এবং সেপাইএর মধ্যে
যে জায়গাটা ফাঁক ছিল সেইখানে তার বুটসুদ্ধ পা সটান চাপিয়ে
দিল।

গোবিন্দবাবু বেজায় চটে গেলেন। ফিরিঙ্গিটার অভদ্রতার
প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে থাকলেও ওর হোঁৎকা চেহারার দিকে তাকিয়ে
একা কিছু করবার উৎসাহ তাঁর হচ্ছিল না। তিনি সেপাইটির দিকে
বক্র কটাক্ষ করলেন, কিন্তু তার রোগা পটকা শরীর দেখে সেদিক
থেকেও বড় ভরসা পেলেন না। অগত্যা নীরবে অপমান হজম করতে
লাগলেন।

কিন্তু একটু পরে তিনি যে অভাবিত দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর
চক্ষুস্থির হয়ে গেল। সেপাইটি করেছে কী, তার ধূলি-ধূসরিত
চরণযুগল সোজা সাহেবের পাশে চাপিয়ে দিয়েছে। বাব্বাঃ,
সেপাইটির সাহস তো কম নয়! তিনি মনে মনে তার তারিফ
করলেন। সামান্য নেটিভের দুঃসাহস দেখে ফিরিঙ্গিটাও স্তম্ভিত হয়ে

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার ফিরিঙ্গি স্বভাব চাড় দিয়ে
উঠল। সে রুক্ষ স্বরে হুকুম করলে—"এইও! গোর হঠা
লেও!"

সোপাইটি কোন জবাবও দেয় না, পাও সরায় না ; যেন শুনতেই পায়নি সে।

সাহেব সেপাইয়ের পাঁজরায় ঠোক্কর মেরে বললে—"এই ? তুম্ শুন্‌তা নেহি ?"

প্রত্যুত্তরে সেপাই পা না সরিয়ে কেবল মৃদু হাসল।

এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সাহেব জীবনে কখনো দেখে নি। সাহেবের হুমকিতে ভয় খায় না, অথচ পদাঘাতের প্রতিশোধ নেবারও চেষ্টা করে না, ভয়ও নেই ক্রোধও নেই—অপমান ও লাঞ্ছনায় হাস্যশীল এমন অপূর্ব সমন্বয়ের সাক্ষাৎ এর আগে সে পায় নি। বিস্ময়ে এবং পরাজয়ে তার স্পর্ধা স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়ে এল। সে এবার গোবিন্দবাবুকে ইংরিজিতে বলল—"তোমার বন্ধুকে পা তুলে নিতে বল।"

গোবিন্দবাবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। এই সামান্য সেপাইটা তাঁর বন্ধু! দস্তুরমত রাগ হল তাঁর। তিনি গোন্দিবাবু, হাকিমের দক্ষিণ হস্ত, আর এই সেপাইটা কিনা তাঁর সমকক্ষ! ফিরিঙ্গির ওপর গোড়া থেকেই তিনি চটেছিলেন, এখন তার এই অন্যায় সন্দেহে তিনি অসম্ভব ক্ষেপে গেলেন। দ্বিরুক্তি না করে উঠেই রাগের মাথায় তিনি ফিরিঙ্গিটার নাকের গোড়ায় এক ঘুসি কসিয়ে দিলেন।

সারা ট্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ফিরিঙ্গিও আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়াল। সেই গাড়িতে হিন্দু স্কুলের জনকতক ছাত্র যাচ্ছিল, তারা গোবিন্দবাবুর পক্ষ নিল। ফিরিঙ্গিটাকে হিড়্-হিড়্ করে রাস্তায় নামিয়ে তুলো ধুনবার উদ্যোগ করল তারা।

যে-সেপাইটি নিজের লাঞ্ছনায় এতক্ষণ নিরুদ্বেগ ও নির্বিকার ছিল, সাহেবের প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনায় এবার সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। "Oh my boys!" বলে ছেলেদের সম্বোধন করে সে বক্তৃতা শুরু করে দিল। সেই বক্তৃতার মর্ম হচ্ছে—

সাহেবের কোন দোষ নেই। তাকে মারবার কোন অধিকার নেই আমাদের। কারুকেই মারবার আমাদের অধিকার নেই। মানুষ যেন মানুষকে আঘাত না করে। তোমরা অন্যায় আচরণ-কারীকে ক্ষমা করতে শেখো, ভালবাসতে শেখো। ভালবাসা দ্বারাই অন্যায়কে জয় করা যায়। অহিংসা পরমো ধর্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেপাইয়ের মুখে ইংরিজির চোস্ত বুলি শুনে গোবিন্দবাবু তো হতভম্ব! এ যদি এমন চমৎকার ইংরিজি জানে তবে এতক্ষণ তা বলে নি কেন? তাহলে কি তাঁকে সারাদিন এমন হিন্দি কসরত করে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়? তাহা, আগে জানলে ডারুইনের বিবর্তনবাদ কত ভাল করেই না একে বোঝানো যেত!

ছেলেরা নিরস্ত হল, কিন্তু গোবিন্দবাবুর উষ্মা যায় না। তিনি বললেন—"ও কেন আমাদের পাশে পা তুলে দিল?"

"ও আরামেব জন্য পা তুলেছে, আমিও আরাম পেয়েছি পা তুলে দিয়েছি। শোধবোধ হয়ে গেছে।"

"ও তোমাকে মারল কেন?

"আমি তো সেজন্য ওকে কিছু বলছি না!"

লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, এই অদ্ভুত লোকটির কথায় ও ব্যবহারে সাহেব চমৎকৃত হয়ে গেছল। সে সিপাইটির করমর্দন করে ও তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলতি একটা মোটরে চড়ে চলে গেল। সেপাইটি গোবিন্দবাবু ও ছেলেদের হয়ে সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল।

ঠ্যাঙাবার এমন দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় গোবিন্দবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি সারা পথ আর বাক্যব্যয় করলেন না, সেপাইয়ের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। ভিতু কোথাকার! যদিও ভাল ইংরিজি বলতে পারে তবু তার কাপুরুষতাকে তো মার্জনা করা যায় না! তাকে গোখলের আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে তিনি

সটান বাড়ি ফিরলেন। সেপাইয়ের সঙ্গে বিদায়-সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না।

পরদিন গোখলের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন—"আপনার সেপাই কিন্তু খাসা ইংরিজি বলতে পারে!"

"সেপাই কৌন্? আরে মোহনদাস! তুম্ সিপাহি বন্ গিয়া!" বলে গান্ধিজিকে ডেকে গোখলে একচোট খুব হাসলেন। গান্ধিজিও হাসতে লাগলেন।

এত হাসাহাসির মর্মভেদ করতে না পেরে গোবিন্দবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই যখন রহস্যভেদ হল, 'সিপাহি'র যথার্থ পরিচয় তাঁর অজ্ঞাত রইল না, তখন তিনি আরো কত বেশি অপ্রস্তুত হয়েছিলেন তা তোমরা অনুমান করতে পার। বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কোন মানুষ এতখানি অপ্রস্তুত হয় নি।

বিদ্যুৎ চমকানোতে ভারি ভয় খায় মেয়েরা; বিশেষ করে পিসিজাতীয় মেয়েরা। যদি পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতায় কিংবা ইস্কুলের টেক্স্‌ট্‌ বুক পড়েও এ-কথাটা আমার ঘুণাক্ষরেও জানা থাকত তাহলে ছুটিতে মুকুন্দপুরে কখনই আমি মরতে যেতাম না। অজ পাড়া-গাঁ মুকুন্দপুর—সাধারণত পিসিদেরই সেখানে বাস।

বাবা বললেন—"যা, অনেকদিন ধরে লেখালেখি করছে তরু। তোকে কবে সেই ছোটবেলায় দেখেছে, দেখতে চায় একবার। তারিণীও খুব খুশি হবে। গরমের ছুটিটা সেইখানেই কাটিয়ে আয় না কেন? গান্ধিজিও বলছেন—ব্যাক টু ভিলেজ—তার মানে, আবার গ্রামে যাও।"

বাবা দারুণ ভক্ত গান্ধিজির। আমি প্রতিবাদ করতে চাই—"উঁহু! তা কী করে হয় বাবা? ব্যাক টু ভিলেজ মানে হবে গ্রামের দিকে পিঠ ফেরাও। অর্থাৎ কিনা, শহরেই থাক।"

"তাই নাকি?" বাবা মাথা চুলকোতে থাকেন—"তাহলে ও-দুইই হয়। গ্রামেও থাক, শহরেও থাক।"

মা ঘাড় নাড়েন—"তা কেন হবে? ব্যাক টু ভিলেজ মানে হল তোমার পিঠ দাও গ্রামকে, অর্থাৎ কিনা, গ্রামকেই তোমার পীঠস্থান কর। তার মানে, গ্রামেই পিঠ দিয়ে পড়ে থাক চিৎ হয়ে।"

মার বাক্যে বাবার উৎসাহ হয়—"তবে তো গান্ধিজির ব্যাখ্যাই ঠিক তাহলে।" হুঁ, আমার বাবা নিদারুণ ভক্ত

গান্ধিজির। "গান্ধির কথা তবে শুনতেই হবে তোকে। তা ছাড়া এখন আমের সময়, পাড়াগাঁয়ে আম প্রচুর। কিনে খেতে হয় না, আমবাগানে গিয়ে হাত বাড়িয়ে গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেই হল; হাতেই এসে পড়বে। মাথাতেও পড়তে পারে। টুপটাপ পড়ছেই। সেই যে রবিঠাকুরের কবিতাটা—

সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম—"

হাত ঝেড়ে মাথা নেড়ে বেশ আবৃত্তি শুরু করেছিলেন বাবা। কিন্তু ধুমে এসেই ধুম করে তাঁকে থেমে পড়তে হয়। তারপর আর মনে পড়ে না। না বাবার, না আমার। আর মা? কবিতার ধার দিয়েই মা যান না। ও-জিনিস তাঁর দু-কর্ণের বিষ।

যাক, অবশেষে রাজিই হলাম। গান্ধিজির কথায় নয়, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসে।

আমের আশায় (আমাশায়!) আমার মুকুন্দপুর আসা। এসেই দেখলাম পিসিরা খুব ভ্রাতুষ্পুত্রবৎসল হয়, বিশেষ করে পিস্তুতো ভাই-বোন যদি না গজিয়ে থাকে। আমার আদর-যত্নের আর অবধি থাকল না। মার কাছেও কখনো এত ভালবাসা পাই নি। মনে মনেই আমি এর একটা ব্যাকরণসঙ্গত সূত্র রচনা করে নিই। মা? মা হচ্ছেন শুধুই মা, সীমার মধ্যে তিনি। কিন্তু পিসিমা? তাঁর পরিসীমা কোথায়?

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। বিদ্যুতের সঙ্গে মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়ত আছে, কিংবা কিছু বৈদ্যুতিক অংশও তাঁদের মধ্যে থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়—তা না হলে বিদ্যুৎ-চমক শুরু হলে মেয়েরাও চমকাতে থাকে কেন? আমার মাকেও চমকাতে দেখেছি, বিনিকেও দেখেছি, বিনির বেড়ালকেও। কিন্তু পিসিমার মত কাউকে নয়। একটা নেংটি ইঁদুরের সামনেও তিনি অকুতো-

ভয়ে অটল থেকে যাবেন,—কিন্তু বিদ্যুৎ চমকালে পিসিমা? তক্ষুনি খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছেন।

সেই দুর্যোগের রাতের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। ভাবলে এখনো হৃৎকম্প হয়। ক্যালামিটি কখনো একা আসে না, খাঁটিই এ কথা। সে রাত্রে তারিণীবাবুও বাড়ি নেই (সম্পর্কে তিনিই আমাব পিসেমশাই), পাশের গ্রামে গেছেন,—জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন, তার নিমন্ত্রণ রক্ষা কবতে। রাত্রে ফিববেন কি না কে জানে।

বাড়িতে কেবল পিসিমা আর আমি। কাজেই খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা চুকতে বেশি দেরি হল না। রাত দশটার মধ্যেই সব খতম। দরজা জানলা ছিটকিনি সমস্ত ভাল করে বন্ধ করবার হুকুম হয়ে গেল। আপত্তির সুরে আমি বলি—"দরজায় তো খিল এঁটেছি, কিন্তু যা গরম পিসিমা! জানলাগুলো বন্ধ করলে তো মারা যেতে হবে!"

"গরমে লোক মারা যায় না," পিসিমা বলেন, "চোরের হাতেই মারা যায়, ডাকাতেব হাতেই মাবা যায়। জানলা খোলা রাখলে চোব-ডাকাত লাফিয়ে আসতে পাবে, তা জানিস? তার ওপরে উনি আবার বাড়ি নেই—সামলাবে কে?"

যেন উনি বাড়ি থাকলেই সামলাতে পারতেন। পিসে হতে পারেন, কিন্তু চোর-ডাকাতকে ধরে পিসে মারবেন, এত ক্ষমতা নেই ওঁর। এ আমি খুব জানি। আমার মন্তব্য কিন্তু মনে-মনেই আমি উচ্চারণ করি। ততক্ষণে পিসিমা কোনো জানলার একটা খড়খড়িও ফাঁক রাখেন না।

অন্ধকাব ঘবে দারুণ গুমোটের মধ্যে ছটফট করতে করতে কখন একটু তন্দ্রার মতো এসেছে, এমন সময়ে—

কড়—কড়—কড়—কড়াৎ—

আচমকা জেগে উঠি। তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্য কোন থেকে আর্তনাদ শোনা যায়—"মণ্টু। ও মণ্টু।"

"পিসিমা। কী পিসিমা?"

"চৌকির তলায় সেঁধো। তাড়াতাড়ি সেঁধিয়ে যা! দেরি করিস নে।"

আমি উঠে বসি। চৌকির তলায় সেঁধুব কেন? চোর-টোর লাফিয়ে এল নাকি? কিন্তু দোর-জানলা তো বন্ধ, ঘর তেমনি অন্ধকার—আসবেই বা কী করে? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকি।

"ঢুকেছিস?"

"উঁহু!"

"ঢুকিস নি এখনো? সর্বনাশ করলি তুই! ঢুকে পড়্ চট্ করে।"

"কেন, কী হয়েছে পিসিমা!"

"এখনো কথা বলে! কী হয়েছে? আকাশে বিদ্যুৎ হানছে যে। বাজ পড়ল শুনলি না?"—পিসিমা ক্ষেপে ওঠেন, "এখন কি তর্ক করার সময়। বলছি না ঢুকে পড়তে!"

পিসিমার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। কড়—কড়—কড়—কড়াৎ—দুম্ দুম্। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে ঝলসে ওঠে।

"মরল ছেলেটা, আমাকেও বেঘোরে মারল!" চাপা কান্নারও শব্দ আসতে থাকে।

কী করি। হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধোতে হয় চৌকির তলায়। "ঢুকেছি পিসিমা!" করুণ সুরেই বলি।

"ঢুকেছিস! আহ্, বাঁচালি। ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের সময় কি বিছানায় থাকতে আছে? শুয়ে পড়িস নি তো চৌকির তলায়?"

"নাঃ। হামাগুড়ি দিয়ে আছি।"

"হামাগুড়ি দিয়ে? কী সর্বনাশ! বিদ্যুৎ চমকানোর সময় কি কেউ হামাগুড়ি দেয়? হাত পা গুটিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বোস!"

উদ্যমের সূত্রপাতেই কিন্তু সংঘর্ষ বাধে, "কী করে বসব? চৌকি লাগছে মাথায়!"

"ভারি বিপদ করলে! এই সময়ে আবার চৌকি লাগছে মাথায়!" পিসিমা চেঁচাতে থাকেন, "এই কি মাথায় চৌকি লাগবার সময়? চৌকি মাথায় করে সোজা হয়ে বোস!"

"উঁহু! মাথায় করা যায় না—বেজায় ভারি যে!" পিসিমাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি, "পিসেমশাই আর আমি দুজনে হলে. হয়ত পারা যেত।"

সত্যি, আমার একার পক্ষে অত বড় চৌকি মাথায় করা অসম্ভব—দস্তুরমত অসম্ভব। আর, কেবল মাথায় করা নয়, মাথায় করে বসে থাকা।

"কী করছিস মণ্টু—" পিসিমা হাঁক ছাড়েন।

"চৌকির তলাতেই আছি। হাত পা গুটিয়েই বসেছি। ঘাট হেঁট করে।"

"ঘাড় হেঁট করে? তবেই মারা গেলি! এই সময় মাথা সোজা করে রাখার নিয়ম যে! চৌকির তলাতেই থাকতে হবে, কিন্তু মাথা উঁচু করে থাকা চাই। তোকে নিয়ে কী করি বল্ তো? একে এই দুর্যোগ—চৌকি কাঁধে করার জন্যে এখন পিসেমশাইকে আমি পাই কোথায়?—"

অকস্মাৎ বিদ্যুতের চমকে পিসিমার বাক্য বাধা পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ কড়াকড় আওয়াজ এবং পিসিমার আনুসঙ্গিক আর্তনাদ—

"হায় মা কালী! হায় মা দুর্গা! কী বিপদই না ডেকে আনছে ছেলেটা! কী করি এখন, হায় মা—"

আমিও মনে মনে বলি, "হায় মা!" দাঁতে ঠোঁট কামড়াই, কী করি এখন? ওদিকে পিসিমার চিৎকার, এদিকে দশমণি চৌকি। মহাপুরুষ ব্যক্তি নই যে অসাধ্য-সাধন করতে পারব। অসম্ভব কাজ কেবল ওরাই পারে। আমার কান্না আসে।

আবার বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রপাতের শব্দ।

"দেখলি, দেখলি তো—তোর ঘাড় হেঁট করে থাকার জন্যে কী সর্বনাশ হচ্ছে! নিজেও মরবি—আমাকেও মারবি তুই—" পুনরায় পিসিমার ফোঁস-ফোঁসানি শুরু হয়। "উঠোনে ঘটিবাটি পড়ে নেই তো? তা হলেই অক্কা পেয়েছি! পেতল-কাঁসার বাসনে ভারি বিদ্যুৎ টানে—"

"গিয়ে দেখে আসব পিসিমা?"

এই তটস্থ দুরবস্থা থেকে যে-কোনো পথে পরিত্রাণের সুযোগ পেতে চাই।

পিসিমা কিন্তু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন—"বাইরে যাবি তুই? এই বিপদের মুখে? কী আক্কেল তোর বল্ দেখি? তোর চেয়ে ঘটিবাটির দামটাই বেশি হল?" একটু থেমেই আবার সেই প্রশ্নাঘাত—"ঘাড় সোজা করলি?"

চৌকির তলায় থাকা এবং মাথা উঁচু করে থাকা যখন একাধারে সম্ভব নয়, তখন অগত্যা ওর আওতা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসি। এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, এবং মাথা উঁচু করে। উঃ, ঘাড়টা কী টনটনই না করছে! দারুণ গরমে চৌকির তলায় প্রাণ একেবারে গলায়-গলায় এসেছিল!

"ঘাড় উঁচু করেই আছি পিসিমা।" অকপটেই বলি এবার।

"আহ্, বাঁচিয়েছিস! পিসিমার স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে, "লক্ষ্মী ছেলে, জাদু ছেলে! যা বলি শোন্। আজকের ভয়ানক রাতটা কেটে যাক, মা দুর্গা করুন, কাল তোকে সকালেই পিঠে করে খাওয়াব। একি, কী করছিস আবার?—"

"দেশলাই জ্বালছি, লণ্ঠন ধরাব। যা অন্ধকার—"

"কী সর্বনাশ! এই সময়ে কেউ আলো জ্বালে?" পিসিমা শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন—"আলোয় যে-রকম বিদ্যুৎ টেনে আনে এমন আর কিছুতে না। নিবিয়ে ফ্যাল্—এক্ষুনি। (কড়—কড়—কড়াৎ—বম্ বম্) দেখলি তো, কী করলি তুই!"

"আমি কী করব? ও তো আপনি হচ্ছে। দেশলায়ে বিদ্যুৎ টেনে আনে কি না তা তুমিই জান। হয়ত টানে, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারে না তো।" আমি একটু বিরক্ত হয়েই বলি।

"এই কি বক্তৃতা করবার সময়? তুই কি মরতে চাস? আমাকেও মারতে চাস সেইসঙ্গে?"

আমি চুপ করে থাকি। কী করব?

"সেই সপ্তবজ্র-নিবারণের মন্ত্রটা মনে আছে তোর? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্। বজ্রাঘাত থেকে বাঁচতে হলে—ওঃ, কী বিচ্ছিরি রাত! কালকের সকাল দেখতে পাব কি না মা কালীই জানেন! কই, পড়ছিস না?"

"জানিই না, তো পড়ব কী?"

"কী মুখ্যু ছেলেটা! এও জানিস না? ইস্কুলে কী ছাই শেখায় তোদের?—অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমন্ত বিভীষণ। কৃপাচার্য দ্রোণাচার্য সপ্তবজ্রনিবারণ॥ ঘন ঘন আওড়া।"

আওড়াতে থাকি। কী আর করব?

শ্লোকপাঠের মধ্যিখানে আর-এক দুর্ঘটনা। পিসিমার পোষা বেড়ালটা কখন আমার পায়ের তলায় এসে হাজির হয়েছে। বেড়ালে আমার ভারি ভয়। লাফিয়ে উঠি আমি। বেড়ালের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় বেড়ালের গায়েই পা চাপিয়ে দিই।

"ম্যাও—" মণ্টু চাপা পড়ে বেড়ালটাও ত্রাহি-ত্রাহি করে—"মিউ—মিয়াও।"

ধুত্তোর! অন্ধকারে যেধারে পা বাড়াই সেখানেই বেড়াল! ও যেন একাই একশো হয়ে সর্বদা পায়ের সঙ্গে লেগেই আছে। পদে পদে এ রকম বেড়ালের উৎপাতের চেয়ে বজ্রপাতও আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

"মণ্টু!" পিসিমার শাসনের কণ্ঠ শুনি, "এই কি আমোদের সময়? আবার বেড়াল-ডাকা হচ্ছে?"

"আমি ডাকিনি পিসিমা।"

"তবে কে ডাকতে গেল? তোমার পিসেমশাই? তিনি কি বাড়ি আছেন যে বেড়াল ডাকবেন? এমনি মিথ্যেবাদী হয়েছ তুমি! ছিঃ! লিখে দেব দাদাকে চিঠিতে, যে তোমার ছেলে যতই বড় হচ্ছেন ততই—"

"সত্যি বলছি পিসিমা, আমি ডাকি নি। আমি কেন ডাকব? বেড়াল—"

আমার কথা শেষ হতে পায় না—"বল্ কে বেড়াল ডাকল তবে? কার এত শখ উথলে উঠল? ভূতে ডাকতে গেল?" পিসিমার কণ্ঠ ক্রমশ কঠোর হয়।

"উঁহু! বেড়াল নিজেই।"

"অ্যাঁ!" আবার পিসিমার আর্তনাদ! তিনি যে বেশ বিচলিত হয়েছেন, অন্ধকারেব মধ্যেও আমি তা টের পাই। "বেড়াল! তবেই হয়েছে! আর আমাদের বক্ষে নেই! বেড়াল ভয়ানক বিদ্যুৎ-বাহী! বেড়ালেব রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিদ্যুৎ—বইতেই লিখে দিয়েছে! কী সর্বনাশ! হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে বাবা অশ্বত্থামা বলি ব্যাস—"

"বাবা নয়, বাবাবা।" আমি ওঁকে সংশোধন কবে দিই—"বহুবচন বলছ না যে পিসিমা?"

"এই সময়ে আবার ইয়ার্কি?" পিসিমা ধমক দেন, "হে হনুমন্ত বাবা বিভীষণ, ছোঁড়াটাকে বাঁচাও! অবোধ ছেলের অপরাধ নিয়ো

না বাবা।" (কড়—কড়—কড়াৎ—বম্ বম্—ববম্ বম্)—পিসিমা যান ক্ষেপে, "এখনো বুঝি ধরে আছিস বেড়ালটাকে? ছুঁড়ে ফেলে দে—ছুঁড়ে ফ্যাল—এই দণ্ডে।"

ছুঁড়ে ফেলা শক্তই হয়, কেননা বেড়ালকে ধারণ করে ছিলাম না তো। কিন্তু পিসিমার আদেশ রাখতেই হবে—যে করেই হোক। অন্ধকারেই আন্দাজ করে বেড়ালের উদ্দেশে এক শুট ঝাড়ি। শুট গিয়ে লাগবি তো লাগ এক তেপায়া টেবিলে; তাতে ছিল পিসেমশাইয়ের ওষুধপত্রের শিশি বোতল (যতরাজ্যের সৌখিন ব্যারাম সব পিসেমশায়ের একচেটে)—সেই এক ধাক্কাতেই টেবিল চিৎপাত এবং শিশি বোতল সব চুরমার।

পিসিমা গোঁ গোঁ করতে থাকেন; অজ্ঞান হয়ে গেলেন কি না, এই ঘুটঘুট্টির মধ্যে তো বোঝবার জো নেই। কিন্তু যখন জানেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত নয়, নিতান্তই টেবিল-পাত - তখন তাঁর গোঙানি থামে, আপনিই সামলে ওঠেন।

"যাক, ভগবান খুব বাঁচিয়েছেন এবার। ওটাকে ঝেড়ে ফেলেছিস তো? বেশ করেছিস। (অন্য সময় হলে তাঁর আদরের মেনির গায়ে কাউকে হাত ঠেকাতেও দেন না, কিন্তু বিদ্যুতের সামনে, বেড়ালের ওপরে পিসিমার চিত্ত নেই।) তুই এক কাজ কর মণ্টু। ঐ তেপায়াটার ওপরে দাঁড়ানোই এখন সবচেয়ে নিরাপদ। দাঁড়িয়েছিস?"

"উঁহু—"

(ফ্যাশ—কড়—কড়াৎ—কড়কড়—ববম্ বম্—বম্ বম্!)

"কী দস্যি ছেলে বাবা! দাঁড়াস নি এখনও? তুই কি আমাকে পাগল করবি? হে মা দুর্গা—"

"দাঁড়িয়েছি পিসিমা।"

(বিদ্যুতের ঝলক—দুমদাম দমাদ্দম কড়—কড় কড়াৎ!)

"এমন দুর্যোগের রাত কাটলে হয়। দোহাই মা দুর্গা! তোর পিসেমশাই কাল এসে আমাদের জ্যান্ত দেখবে কি না কে জানে! পরের ছেলেকে এনে কী বিপদেই পড়লুম! বাজ পড়ে মরলে দাদাকে আমি কৈফিয়ত দেব কী?—"

অতি সন্তর্পণে এবং সসঙ্কোচে ক্ষীণকায় তেপায়ার ওপর সসেমিরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। নীরবে পিসিমার কাতরোক্তি শুনি। বাড়িতে বাজ পড়লে কৈফিয়ত দেবার জন্য পিসিমাও অবশিষ্ট থাকবেন কি না আমার সন্দেহ হয়।

"মন্টু, ভূমিকম্পর সময় কী করে রে? শাঁখ ঘণ্টা বাজায়, না? ওতেই ভূমিকম্প থেমে যায়—নয় কী? ঝড়-বৃষ্টি কি ভূমিকম্পের চেয়ে কম মারাত্মক? আয়, আমরা শাঁখ ঘণ্টা বাজাই—তাহলে ঝড়-বৃষ্টিও থামবে। শাঁখ এই কুলুঙ্গিতেই আছে, আমি নিচ্ছি। ওধারের তাক থেকে ঘণ্টাটা তুই পেড়ে আন্। অন্ধকারে পারবি তো?"

অন্ধকারেই আমি ঘাড় নাড়ি।

"আর-একটা ছোট শাঁখ আছে ঐ তাকেই। সেটাও নিয়ে আয়। একসঙ্গে শাঁখ ঘণ্টা বাজাতে পারবি না?"

"পারব বই কি," আমি বলে দিই। এখন মরীয়া। আর, মরীয়া হলে মানুষ কী না পারে!

"এনেছিস?—বড্ড দেরি করছিস তুই! বাঁচতে আর দিলি না আমাদের!"

তাকের এবং শাঁখের অন্বেষণে তিনটে চেয়ার ওলটাই, গোটাকত গেলাস ফেলি, জলের কুঁজোটাকে নিপাত করি। অবশেষে ঘণ্টাকে পাই। "এনেছি পিসিমা—কিন্তু শাঁখ পেলাম না, কেবল ঘণ্টা।"

"বেশ, এবার ঐ তেপায়াটার ওপর দাঁড়া। খুব জোরে জোরে পেট—যেন আকাশের দেবতারা শুনতে পান। আমি শাঁখ বাজাচ্ছি।"

পিসিমা শাঁখ বাজান, আমি ঘণ্টা পিটি। প্রাণপণেই পিটি। কানের সমস্ত পোকা বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ একটা জানলা খুলে যায়, এক ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। চোর নাকি? পিসিমা ভয়ে কাঠ হয়ে যান। আমিও ঘণ্টাবাদ্য থামিয়ে দিই।

"ডাকাত পড়েছে নাকি?" ছায়ামূর্তি বলে, "তোরা কী লাগিয়েছিস মণ্টে? এসব কী কাণ্ড?"

"বিদ্যুৎ তাড়াচ্ছি পিশেমশাই!" করুণ কণ্ঠে বলি আমি।

"বিদ্যুৎ! আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, বিনা মেঘেই বিদ্যুৎ? এমন খাসা চাঁদনি রাত, আর তোদের কাছে বজ্রাঘাত? বাইরে চেয়ে ছাখ্ দেখি!"

তাই তো! বাইরে তাকিয়ে দেখি, পরিষ্কার ধবধবে জ্যোৎস্না। আমি ও পিসিমা দুজনেই দেখি। পিসিমা বলেন, "তাহলে এত দুমদাম ধুমধাম বজ্রপাতের শব্দ, বিদ্যুতের ঝলকানি—এসব কী তবে?"

"ওঃ, ঐ আওয়াজ!" পিসেমশায়ের উচ্চহাস্য আরম্ভ হয়—"জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন কিনা! কলকাতা থেকে যত-রাজ্যের বাজির অর্ডার দিয়েছে। রাত এগারোটার ট্রেনে এসে পৌঁছোল—বোম-পটকা; দুধাঁড়ি, উড়ন-তুবড়ি, হাউই—আরো কত কী। এতক্ষণ তো বাজি পোড়ানোই হচ্ছিল—তারই ঝলক দেখেছ, তারই আওয়াজ শুনেছ তোমরা।"

পিসেমশায়ের হাসি আর থামতে চায় না।

নরখাদকের কবলে

শিরোনাম দেখেই বুঝতে পারছ, এটা একটা ভীষণ অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। যথার্থই তাই, যদিও এটা পড়ে শেষাশেষি হয়ত তোমাদের হাসিই পাবে। সত্যিই ভারি রোমাঞ্চকর ঘটনা—নিতান্তই একবার আমি এক ভয়ঙ্কর নরখাদকের পাল্লায় পড়েছিলাম।

আফ্রিকার জঙ্গলে কি কোন অজ্ঞাত উপদ্বীপের উপকূলে নয়—এই বাংলাদেশের বুকেই, একদিন ট্রেনে যেতে যেতে। সেই অভাবনীয় সাক্ষাতের কথা স্মরণ করলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়।

বছর-আষ্টেক আগের কথা, সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছি—মামার বাড়ি যাচ্ছি বেড়াতে। রানাঘাট পর্যন্ত যাব, তাই ফুর্তি করে যাবার মতলবে বাবার কাছে যা টাকা পেলাম তাই দিয়ে একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে ফেললাম। বহুকাল থেকেই লোভ ছিল ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসে চাপবার, এত দিনে তার সুযোগ পাওয়া গেল। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—কথাটা প্রায় ভুলে গেছলাম। ভুলে ভালই করেছিলাম বোধ করি, নইলে এই অদ্ভুত কাহিনী শোনার সুযোগ পেতে না তোমরা।

সমস্ত কামরাটায় একা আমি, ভাবলাম আর কেউ আসবে না তাহলে। বেশ আরামে যাওয়া যাবে একলা এই পথটুকু। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পূর্বমুহূর্তেই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে উঠলেন। এক-মাথা পাকা চুলই তাঁর বার্ধক্যের একমাত্র প্রমাণ, তা নাহলে শরীরের বাঁধুনি, চলা-ফেরার উদ্যম, বেশ-বাসের ফিটফাট কায়দা থেকে ঠিক তাঁর বয়স কত অনুমান করা কঠিন।

গাড়িতে আমরা দুজন, বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও অল্পক্ষণেই আমাদের আলাপ জমে উঠল। ভদ্রলোক বেশ মিশুক, প্রথম কথা পাড়লেন তিনিই। এ-কথায় সে-কথায় আমরা দমদম এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ একটা তারস্বর আমাদের কানে এল—"অজিত, এই অজিত, নেমে পড় চট করে! গাড়ি ছেড়ে দিল যে!"

সহসা ভদ্রলোকের সারা মুখ চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ত্বরিত দৃষ্টিতে সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা একবার তিনি দেখে নিলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"নাঃ, সে-অজিতের কাছ দিয়েও যায় না!"

কিছু বুঝতে না পেরে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম। ভদ্রলোক বললেন—"অজিত নামটা শুনে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল আমার। কিন্তু নাঃ, এ-অজিত সে-অজিতের কড়ে আঙুলের যোগ্যও নয়—এমনি খাসা ছিল সে অজিত! অমন মিষ্টি মানুষ আমি জীবনে দেখিনি! শুনবে তুমি তার কথা?"

আমি ঘাড় নাড়তে তিনি বললেন—"গল্পের মাঝ-পথে বাধা দিয়ো না কিন্তু। গল্প বলছি বটে, কিন্তু এর প্রত্যেকটা বর্ণ সত্য। শোন তবে।—"

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে তিনি শুরু করলেন: বছর-পঞ্চাশ কি তার বেশিই হবে, তখন উত্তর-বর্মায় যাওয়া খুব বিপদের ছিল। চারিধারে জঙ্গল আর পাহাড়। জঙ্গল কেটে তখন সবে নতুন রেল লাইন খুলেছে সেই অঞ্চলে—অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাঝে-মাঝে এমন ধ্বসে যেত সে গাড়ি-চলাচল বন্ধ হয়ে যেত একেবারে। তার ওপরে পাহাড়ে ঝড়, অরণ্য-দাবানল হলে তো কথাই ছিল না। রেঙ্গুন থেকে সাহায্য এসে পৌঁছতে লাগত অনেক দিন—এর মধ্যে যাত্রীদের যে কী দুরবস্থা হত তা কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে।

তখনকার উত্তর-বর্মা ছিল এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ঠাণ্ডা,

রীতিমত বরফ পড়ত—সময়ে সময়ে চারিধারে শাদা বরফের স্তূপ জমে যেত। এখন তো মগের মুলুকের প্রকৃতি অনেক নম্র হয়ে এসেছে, তার ব্যবহারও এখন ঢের ভদ্র। সেই সময়কার ব্রহ্মদেশের মেজাজ ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে।

সেই সময় একবার এক ভয়ানক বিপাকে আমি পড়েছিলাম—আমি এবং আরো আঠারো জন। আমরা উত্তর-বর্মায় যাচ্ছিলাম। আমরা উনিশজনই ছিলাম সমস্ত গাড়ির যাত্রী। উনিশ জনই বাঙালী। প্রথম রেল লাইন খুলেছিল, কিন্তু দুর্ঘটনার ভয়ে সেখানকার অধিবাসীরা কেউ রেলগাড়ি চাপত না। ভয় ভাঙাবার জন্যে রেল কোম্পানি প্রথম-প্রথম বিনা টিকিটে গাড়ি চাপবার লোভ দেখাতেন। বিনা পয়সার লোভে নয়, অ্যাডভেঞ্চারের লোভে রেঙ্গুনের উনিশজন বাঙালী আমরা তো বেরিয়ে পড়লাম।

সহযাত্রী মোটে এই কজন—কাজেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হতে দেরি হল না। কোন্‌খানে যে সেই ভয়াবহ পাহাড়ে ঝড় নামল আমার ঠিক মনে পড়ে না এখন, তবে, রেলপথের প্রায় প্রান্তসীমায় এসে পড়েছি। ওঃ, সে কী ঝড়—সেই দুর্দান্ত ঝড় ঠেলে একটু একটু করে এগুচ্ছিল আমাদের গাড়ি,—অবশেষে একেবারেই থেমে গেল। সামনের রেল লাইন ছোট-বড় পাথরের টুকরোয় ছেয়ে গেছে—সেইসব চাঙড় না সরিয়ে গাড়ি চালানোই অসম্ভব। অতএব পিছোনো ছাড়া উপায় ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরে এক মাইল আমরা পিছোলাম। এত আস্তে গাড়ি চলছিল, চলছিল আর থামছিল, যে মানুষ হেঁটে গেলে তার চেয়ে বেশি যায়। কিন্তু পিছিয়েই কি রেহাই আছে? একটু পরেই জানা গেল যে পেছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধ্বস নেমেছে। ঘণ্টাখানেক আগে যে রেলপথ কাঁপিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটেছে, এখন কোথাও তার চিহ্ন নেই।

এতএব আবার এগুতে হল। যেখানে যেখানে পাথরের টুকরো জমেছে, আমরা সব নেমে লাইন পরিষ্কার করব ঠিক হল। তা ছাড়া আর কী উপায় বল? কিন্তু সেদিকেও ছিল অদৃষ্টের পরিহাস। কিছু দূর এগিয়েই ঝড়ের প্রবল ঝাপটায় ট্রেন ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে গেল। লাইন থেকে পাথর তোলা এক কথা এবং গাড়িতে লাইন তোলা আরেক কথা। পাঁচ দশ জনে মিলে অনেক ধরাধরি করলে এক-আধটা চাঙড় যে না সরানো যায় তা নয়, কিন্তু সবাই মিলে বহুত ধস্তাধস্তি করলেও গাড়িকে লাইনে তোলা দূরে থাক, এক ইঞ্চিও নড়ানো যায় না। এমনকি আমরা উনিশ জন মিলেও যদি কোমর বেঁধে লাগি, তাহলেও তার একটা কামরাও লাইনে তুলতে পারব কি না সন্দেহ। তারপরে ঐ লম্বা চৌড়া চোস্ত ইঞ্জিন—ওকে তুলতে হলেই তো চক্ষুস্থির! ওটা কত মণ কে জানে! আমরা ইঞ্জিনের দিকে একবার দৃকপাত করে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম।

পেছনের অবস্থা তো দেখেই আসা গেল, সামনেও যদি তাই ঘটে থাকে, তাহলেই তো চক্ষুস্থির! কেননা যেদিক থেকেই হোক, রেলপথ তৈরি করে সাহায্য এসে পৌঁছতে ক-দিন লাগবে কে জানে! চারিধারে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল, একশো মাইলের ভেতরে মানুষের বাসভূমি আছে কি না সন্দেহ। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গের যা খাবার-দাবার তা তো এক নিশ্বাসেই নিঃশেষ হবে—তারপর? যদি আরো দু'দিন এইভাবে থাকতে হয়? আরো দু'সপ্তাহ? কিম্বা আরো দু'মাস? ভাবতেও বুকের রক্ত জমে যায়।

পরের কথা তো পরে—এখন কী করে রক্ষা পাই? যে প্রলয় ঝড়, গাড়ি-সমেত উড়িয়ে না নিয়ে যায় তো বাঁচি। মাঝে মাঝে যা এক-একটা ঝাপটা দিচ্ছিল, উড়িয়ে না নিক, গাড়িকে কাত কিম্বা চিৎপাত করার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। নিজের নিজের রুচিমত

দুর্গানাম, রামনাম কিম্বা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম জপতে শুরু করলাম আমরা।

সে-রাত তো কাটল কোনরকমে, ঝড়ও থেমে গেল ভোরের দিকটায়। কিন্তু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে খিদেও জোর হয়ে উঠল। বর্মার হাওয়ায় খুব খিদে হয় শুনেছিলাম, প্রথম দিনেই সেটা টের পাওয়া গেল। খিদের বিশেষ অপরাধ ছিল না—যে হাওয়াটা কাল আমাদের ওপর দিয়ে গেছে!

কিন্তু নাঃ, কারু টিফিন ক্যারিয়ারে কিছু নেই, যার যা ছিল কাল রাত্রেই চেটে-পুটে সাবাড় করেছে। কেবল অ্যালুমিনিয়াম প্লেটগুলো পড়ে রয়েছে, আমাদের উদরের মত শোচনীয় অবস্থায়—একদম ফাঁকা। সমস্ত দিন যে কী অস্বস্তিতে কাটল কী বলব! রাত্রে কষ্ট-কল্পিত নিদ্রার মধ্যে তবু কিছু শান্তির সন্ধান পাওয়া গেল—বড়-বড় ভোজের স্বপ্ন দেখলাম।

দ্বিতীয় দিন যা অবস্থা দাঁড়াল, তা আর কহতব্য নয়। সমস্ত সময় গল্প-গুজব করে, তর্কাতর্কি করে, বাজে বকে, উচ্চাঙ্গের গবেষণার ভান করে, খিদের তাড়নাটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করলাম। গোঁফে চাড়া দিয়ে খিদের চাড়াটা দমিয়ে দিতে চাইলাম—তারপরে এল তৃতীয় দিন।

সেদিন আর কথা বলারই উৎসাহ নেই কারো—রেলগাড়ির চার-দিকে ঘুরে, আনাচ-কানাচ লক্ষ্য করে, অসম্ভব আহার্যের অস্তিত্ব পরিকল্পনায় সেদিনটা কাটল। চতুর্থ দিন আমাদের নড়া-চড়ার স্পৃহা পর্যন্ত লোপ পেল—সবাই এক-এক কোনে বসে দারুণভাবে মাথা ঘামাতে লাগলাম।

তারপর পঞ্চম দিন। নাঃ, এবার প্রকাশ করতেই হবে কথাটা—আর চেপে রাখা চলে না। কাল সকাল থেকেই কথাটা আমাদের মনে উঁকি মারছিল, বিকেল নাগাদ কায়েম হয়ে বসেছিল—এখন প্রত্যেকের জিভের গোড়ায় এসে অপেক্ষা করছে

সেই মারাত্মক কথাটা—বোমার মত এই ফাটল বলে। বিবর্ণ, রোগা, বিশ্রী বিশ্বনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বক্তৃতার কায়দায় শুরু করলেন—"সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ"—

কী কথাটা যে আসছে আমরা সকলেই তা অনুমান করতে পারলাম। উনিশজোড়া চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি এক মুহূর্তে যেন বদলে গেল, অপূর্ব সম্ভাবনার প্রত্যাশায় সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে নড়ে-চড়ে বসলাম।

বিশ্বনাথবাবু বলে চললেন—"ভদ্রমহোদয়গণ, আর বিলম্ব করা চলে না। অহেতুক লজ্জা, সঙ্কোচ বা সৌজন্যের অবকাশ নেই। সময় খুব সংক্ষিপ্ত—আমাদের মধ্যে কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি আজ বাকি সকলের খাদ্য জোগাবেন, এখনই আমাদের তা স্থির করতে হবে!"

শৈলেশবাবু উঠে বললেন, "আমি ভোলানাথবাবুকে মনোনীত করলাম।"

ভোলানাথবাবু বললেন, "কিন্তু আমার পছন্দ অমৃতবাবুকেই।"

অমৃতবাবু উঠলেন—অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে তিনি লজ্জিত কি মর্মাহত ঠিক বোঝা গেল না, নিজের সুপুষ্ট দেহকেই আজ সবচেয়ে বড় শত্রু বলে তাঁর বিবেচনা হল। আমতা আমতা করে তিনি বললেন, "বিশ্বনাথবাবু আমাদের মধ্যে প্রবীণ এবং শ্রদ্ধেয়, তা ছাড়া তিনি একজন বড় বক্তাও বটেন। আমার মতে প্রাথমিক সম্মানটা তাঁকেই দেওয়া উচিত, অতএব তাঁর সপক্ষে আমি নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করছি।"

কমল দত্ত বললেন, "যদি কারুর আপত্তি না থাকে তাহলে অমৃতবাবুর অভিলাষ গ্রাহ্য করা হবে।"

সুধাংশুবাবু আপত্তি করাতে অমৃতবাবুর পদত্যাগ অগ্রাহ্য হল; এই একই কারণে ভোলানাথবাবুর রেজিগনেশনও গৃহীত হল না।

শঙ্করবাবু বললেন, "ভোলানাথবাবু এবং অমৃতবাবু—এঁদের মধ্যে কার আবেদন গ্রাহ্য করা হবে, অতঃপর ভোটের দ্বারা তা স্থির করা যাক।"

আমি এই সুযোগ গ্রহণ করলাম, "ভোটাভুটির ব্যাপারে একজন চেয়ারম্যান দরকার, নইলে ভোট গুনবে কে? অতএব আমি নিজেকে চেয়ারম্যান মনোনীত করলাম।"

ওদের মধ্যে আমিই ছিলাম দূরদর্শী। সাহায্য এসে না পৌঁছোন তক্ নিত্যকার ভোটায়নের জন্যে চেয়ারম্যানকেই কষ্ট করে টিকে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত, এটা আমি সূত্রপাতেই বুঝতে পেরেছিলাম। অমৃতবাবুর দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকাতে, আমি সকলের বিনা-অসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়ে গেলাম।

অতঃপর প্রভাসবাবু উঠে বললেন, "আজকের দুপুরবেলার জন্যে দুজনের কাকে বেছে নেওয়া হবে, সেটা এবার সভাপতি মশাই ব্যালটের দ্বারা স্থির করুন।"

নাদুবাবু বললেন, "আমার মতে ভোলানাথবাবু নির্বাচনের গৌরব লাভের অযোগ্য। যদিও তিনি কচি এবং কাঁচা, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি অত্যন্ত রোগা ও সিড়িঙ্গে। অমৃতবাবুর পরিধিকে অন্তত এই দুঃসময়ে, আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না।"

শৈলেশবাবু বললেন, "অমৃতবাবুর মধ্যে কী আছে? কেবল মোটা হাড় আর ছিবড়ে। তাছাড়া পাকা মাংস আমার অপছন্দ, অত চর্বিও আমার ধাতে সয় না। সেই তুলনায় ভোলানাথবাবু হচ্ছেন ভালুকের কাছে পাঁঠা। ভালুকের ওজন বেশি হতে পারে —কিন্তু ভোজনের বেলায় পাঁঠাতেই আমাদের রুচি।"

নাদুবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "অমৃতবাবুর রীতিমত মানহানি হয়েছে, তাঁকে ভালুক বলা হয়েছে—অমৃতবাবুর ভয়ানক রেগে যাওয়া উচিত আর প্রতিবাদ করা উচিত—"

অমৃতবাবু বললেন, "শৈলেশবাবু ঠিকই বলেছেন, এত বড় খাঁটি কথা কেউ বলেনি আমার সম্বন্ধে। আমি যথার্থই একটা ভালুক।"

অমৃতবাবুর মত কূটতার্কিক যে এত সহজে পরের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন, আশা করতে পারিনি। বুঝতে পারলাম, তাঁর আত্মগ্লানির মূলে রয়েছে struggle for existence। যাক, ব্যালট নেওয়া হল। কেবল ভোলানাথবাবুর নিজের ছাড়া আর সকলের ভোট তাঁর সপক্ষে গেল। অমৃতবাবুর বেলাও তাই, একমাত্র অমৃতবাবু স্বয়ং নিজের বিপক্ষে ভোট দিলেন।

অগত্যা দুজনের নাম একসঙ্গে ব্যালটে দেওয়া হল—দুজনেই সমান সমান ভোট পেলেন। অর্ধেক লোক পরিপুষ্টতার পক্ষপাতী, বাকি অর্ধেকের মত হচ্ছে, 'যৌবনে দাও রাজটীকা'।

এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান সভাপতির ওপর নির্ভর করে; আমার ভোটটা অমৃতবাবুর তরফে দিয়ে অশোভন নির্বাচন প্রতিযোগিতার অবসান করলাম। বলা বাহুল্য, এতদিনের একাদশীর পর অমৃতে আমার বিশেষ অরুচি ছিল না।

ভোলানাথবাবুর পরাজয়ে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ দেখা গেল, তাঁরা নতুন ব্যালট দাবি করে বসলেন। কিন্তু রান্নাবান্নার জোগাড়ের জন্যে মহা সমারোহে সভাভঙ্গ হয়ে যাওয়ায়, ভোলানাথবাবুকে বাধ্য হয়ে স্থগিত রাখতে হল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা নোটিশ দিয়ে রাখলেন, পরদিনের নির্বাচনে তাঁরা পুনরায় ভোলানাথবাবুর নাম তুলবেন। কালও যদি যোগ্যতম ব্যক্তির দাবি অগ্রাহ্য করা হয়, তাহলে তাঁরা সবাই একযোগে হাঙ্গার-স্ট্রাইক করবেন বলে শাসালেন।

কয়েক মুহূর্তেই কী পরিবর্তন! পাঁচদিন নিরাহারের পর চমৎকার ভোজের প্রত্যাশায় প্রত্যেকের জিভই তখন লালায়িত হয়ে উঠেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা যেন আশ্চর্য রকম বদলে

গেলাম—কিছুক্ষণ আগে আমরা ছিলাম আশাহীন, ভাষাহীন, খিদের তাড়নায় উন্মাদ—অর্ধমৃত; আর তখন আমাদের মনে আশা, চোখে দীপ্তি, অন্তরে উচ্ছল ভালবাসা।—এমন একটা প্রগাঢ় প্রেম, যা মানুষের প্রতি মানুষ কদাচই অনুভব করে! এমন একটা অপূর্ব পুলক, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! অর্ধ-মুমূর্ষুতা থেকে একেবারে নতুন জীবন! আমি শপথ করে বলতে পারি, তেমন অনির্বচনীয় অনুভূতির আস্বাদ জীবনে আমি পাইনি।

অমৃতকে আমি আন্তরিক পছন্দ করেছিলাম। সত্যিই ভাল লেগেছিল ওকে আমার। স্থূল মাংসল বপু, যদিও কিছুটা অতিরিক্ত রোমশ (শৈলেশবাবু ভালুক বলে বেশি ভুল করেননি), তবু ওঁকে দেখলেই চিত্ত আশ্বস্ত হয়, মন কেমন খুশি হয়ে ওঠে। ভোলানাথও মন্দ নয় অবশ্য; যদিও একটু রোগা, তবু উঁচুদরের জিনিস তাতে সন্দেহ নেই। তবে পুষ্টিকারিতা এবং উপকারিতার দিক থেকে বিবেচনা করলে অমৃতর দাবি সর্বপ্রথম। অবশ্য ভোলানাথের উৎকৃষ্টতার সপক্ষেও অনেক কিছু বলবার আছে, তা আমি অস্বীকার করবার চেষ্টা করব না। তবু মধ্যাহ্ন-ভোজনের পাতায় পড়বার যোগ্যতা ওঁর ছিল না, বড়-জোর বিকেলের জলখাবার হিসেবে ওঁকে ধরা যেতে পারে।

দীর্ঘ উপবাসের পর প্রথম দিনের আহারটা একটু গুরুতরই হয়ে গেল। অমৃত এতটা গুরুপাক হবে আমরা ভাবিনি—বাইরে থাকতে যিনি আমাদের হৃদয়ে এতটা আবেগ সঞ্চার করেছিলেন, ভিতরে গিয়ে তিনি যথেষ্টই বেগ দিলেন। সমস্ত দিন আমরা অমৃতের ঢেঁকুর তুললাম। সকলেরই পেট (এবং সঙ্গে সঙ্গে মন) খারাপ থাকায়, পরদিন লঘু পথ্যের ব্যবস্থাই সঙ্গত স্থির হল—অতএব কচি ও কাঁচা ভোলানাথবাবুকে জলযোগ করেই সেদিন আমরা নিরস্ত হলাম।

তার পরদিন আমরা অজিতকে নির্বাচিত করলাম। ওরকম

সুস্বাদু কিছু আর কখনো আমরা খাইনি জীবনে। সত্যিই ভারি উপাদেয়। তার বৌকে পরে চিঠি লিখে আমি সে-কথা জানিয়েছি। একমুখে তার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না—চিরদিন ওকে আমার মনে থাকবে। দেখতেও যেমন সুশ্রী, তেমনি মার্জিতরুচি, তেমনি চারটে ভাষায় ওর দখল ছিল। বাংলা তো বলতে পারতই, তা ছাড়া ইংরিজি, হিন্দি এবং উড়েতেও অনর্গল তার খই ফুটত। হিন্দি একটু ভুলই বলত, তা বলুক গে, তেমনি এক-আধটু ফ্রেঞ্চ আর জার্মানও ওর জানা ছিল, তাতেই ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছল। ক্যারিকেচার করতেও জানত, সুর ভাঁজতেও পারত,—বেশ মজলিশি ওস্তাদ লোক—এক কথায়, অমন সরেশ জিনিস আর কখনও ভদ্রলোকের পাতে পড়েনি। খুব বেশি ছিবড়েও ছিল না, খুব চর্বিও নয়; ওর ঝোলটাও ভারি খাসা হয়েছিল। এখনো যেন সে আমার জিভে লেগে রয়েছে!

তার পরদিন বিশ্বনাথবাবুকে আমরা আত্মসাৎ করলাম—বুড়োটা যেমন ভূতের মত কালো তেমনি ফাঁকিবাজ, কিছু তার গায়ে রাখেনি, যাকে বলে আমড়া—আঁটি আর চামড়া। পাতে বসেই আমি ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম—"বন্ধুগণ, আপনাদের যা খুশি করতে পারেন, আবার নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমি হাত গুটোলাম।" শৈলেশবাবুও আমার পথে এলেন, বললেন—"আমারও ঐ মত। ততক্ষণ আমিও অপেক্ষা করব।"

অজিতকে সেবা করার পর থেকে আমাদের অন্তরে যে আত্ম-প্রসাদের ফল্গুধারা অগোচরে বইছিল, তাকে ক্ষুণ্ণ করতে কারোই ইচ্ছে ছিল না। কাজেই আবার ভোট নেওয়া শুরু হল—এবার সৌভাগ্যক্রমে শৈলেশবাবুই নির্বাচিত হলেন। তাঁর এবং আমাদের উভয়েরই সৌভাগ্য বলতে হবে; কেননা, কেবল রসিক লোক বলেই তাঁকে জানতাম, সরস লোক বলেও জানলাম তাঁকে। তোমাদের বিশ্বকবির ভাষায় বলতে গেলে, তাঁর যে-পরিচয়

আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেই নতুন পরিচয়ে তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ হলেন।

তারপর? তারপর—একে একে ব্যোমকেশ, নিরঞ্জন, কেদারনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ—গঙ্গাগোবিন্দর নির্বাচনে খুব গোলমাল হয়েছিল, কেননা ও ছিল যেমন রোগা তেমনি বেঁটে—তারপরে নিতাই থোকদার—থোকদারের এক পা ছিল কাঠের—সেটা একটা থোক ক্ষতি, তবে সুস্বাদুতার দিক থেকে সে মন্দ ছিল না নেহাত— অবশেষে এক ব্যাটা ভ্যাগাবণ্ড, সঙ্গী হিসেবে সে মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না, খাদ্য হিসেবেও তাই। তবে, রিলিফ এসে পৌঁছবার আগে যে তাকে খতম করতে পারা গেছল এইটাই সুখের বিষয়। নিতান্তই একটা আপদ-চুকোনো দায় আর-কি!

রুদ্ধনিশ্বাসে আমি ভদ্রলোকের কাহিনী শুনছিলাম, এতক্ষণে আমার বাক্যস্ফূর্তি হল—"তাহলে রিলিফ এসেছিল শেষে?"

"হ্যাঁ। কবির ভাষায়, একদা সুপ্রভাতে, সুন্দর সূর্যালোকে, নির্বাচনও সদ্য শেষ হয়েছে, আর রিলিফ ট্রেনও এসে পড়ল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল, তা নইলে আজ আমাকে দেখবার সৌভাগ্য হত না তোমার।.....এই যে ব্যারাকপুর এসে পড়ল, এখানেই আমি নামব। ব্যারাকপুরেই আমি থাকি, গঙ্গার ধারে—যদি কখনো সুবিধে হয়, দু'একদিনের জন্যে বেড়াতে এসো আমার ওখানে। ভারি খুশি হব তাহলে। তোমাকে দেখে আমার কেমন বাৎসল্য-ভাব জাগছে। বেশ ভাল লাগল তোমাকে, এমনকি অজিতকে যতটা ভাল লেগেছিল, প্রায় ততখানিই, এ কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। তুমিও খাসা ছেলে,—আচ্ছা আসি তাহলে।"

ভদ্রলোক বিদায় হলেন। এমন বিমূঢ়, বিভ্রান্ত আর বিপর্যস্ত আমি কখনো হইনি। বৃদ্ধ চলে যাবার পর আমার আত্মাপুরুষ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু-মধুর, চালচলন অত্যন্ত

ভদ্র—কিন্তু হলে কী হবে, যখনই তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমার হাড়-পাঁজরা পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল। কি রকম যেন ক্ষুধিত দৃষ্টি তাঁর চোখে—বাবাঃ! তারপর তাঁর বিদায়-বাণীতে যখন জানালেন যে তাঁর মারাত্মক স্নেহ-দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এমনকি তাঁর মতে আমি অজিতের চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নই,—তেমনি খাসা এবং বোধকরি তেমনি উপাদেয়—তখন আমার বুকের কাঁপুনি পর্যন্ত বন্ধ হবার মত হয়েছিল।

তিনি যাবার আগে মাত্র একটি প্রশ্ন তাঁকে করতে পেরেছিলাম —"শেষ পর্যন্ত আপনাকেও ওরা নির্বাচন করেছিল?"

"শেষপর্যন্ত আমিই বাকি ছিলাম কিনা! আগের দিন ভ্যাগাবণ্ডটার পালা গেছল; আমি একাই সমস্তটা ওকে সাবাড় করেছিলাম। বলব কী, পাহাড়ের হাওয়ায় যেমন আমার খিদে হত, তেমনি হজম করবার ক্ষমতাও খুব বেড়ে গেছল। হতভাগা লোফারটা শেষ পর্যন্ত টিকেই ছিল, তার কারণ অখদ্যে লোক বলে তাকে খাদ্য করতে আর সবার আপত্তি ছিল। কিন্তু খাবার জিনিসে অত গোঁড়ামি নেই আমার—উদরের ব্যাপারে আমি খুব উদার। তাছাড়া এতদিনেও নির্বাচিত হবার সুযোগ না পেয়ে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মনক্ষোভ জেগেছিল ওর; আমার কাছে আত্মমর্যাদা লাভ করে সে যে কৃতার্থ হয়েছে, এতে আমার সন্দেহ নেই।

"হ্যাঁ, তুমি কী জানতে চাচ্ছিলে, কী করে আমার পালা হল? পরদিন আবার নির্বাচনের সময় এল। কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায়, আমি যথারীতি নির্বাচিত হয়ে গেলাম বিনা বাধায়। তারপর কারু আপত্তি না থাকায়, আমি তৎক্ষণাৎ সম্মানার্হ পদ পরিত্যাগ করলাম। আপত্তি করবার কেউ ছিলও না তখন। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল ট্রেনটা—দুরূহ কর্তব্যের দায় থেকে রেহাই পেলাম আমি—নিজেকে আর গলাধঃকরণ করতে হল না আমায়—।"

গুরুচণ্ডালী

সীতানাথবাবু ছিলেন সেকেণ্ড পণ্ডিত, বাংলা পড়াতেন। ভাষার দিকে তাঁর দৃষ্টি একটুও ভাসা-ভাসা ছিল না—ছিল বেশ প্রখর। ছেলেদের লেখার মধ্যে গুরুচণ্ডালী তিনি মোটেই সইতে পারতেন না।

সপ্তাহের এক দিন ছিল ছেলেদের রচনার জন্যে ধরা। ছেলেরা বাড়ি থেকে রচনা লিখে আনত—একেক সময়ে ক্লাসে বসেও লিখত। সীতানাথবাবু সেই সব রচনা পড়তেন, পড়ে পড়ে আগুন হতেন। ছাত্রদের সেই রচনা পরীক্ষা করা সীতার অগ্নি-পরীক্ষার মতই একটা উত্তপ্ত ব্যাপার ছিল সীতানাথবাবুর কাছে।

এত করে বকেও গুরুচণ্ডালী দোষ যে কাকে বলে ছাত্রদের তিনি তা বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি—উক্ত দোষ-মুক্ত করা তো দূরে থাক।

সেদিনও তিনি ক্লাসসুদ্ধু ছেলের রচনার খাতায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন—

দেখতে দেখতে তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠল, হাতের দু'রঙা পেনসিলের লাল দিকটা ঘস-ঘস করে চলতে লাগল খাতার ওপর—রচনার লাইনগুলো ফস-ফস করে লাল দাগে কেটে কেটে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এর চেয়ে ছেলেদের চাবকে লাল করা যেন সোজা ছিল ঢের—ছিল ঢের আরামের—আর তা করতে পারলে যেন গায়ের ঝাল মিটত তাঁর।

খাতাগুলো পাশে সরিয়ে রেখে তিনি বললেন—"এ আর কী দেখব! খালি গুরুচণ্ডালী! কতবার বলেছি হয় সাধু ভাষায়

লেখো, নয় কথ্য ভাষায়। যেটাতেই লেখো তা ঠিক হবে, কিন্তু এক রকমের হওয়া চাই। সাধু ভাষা আর কথ্য ভাষায় মিশিয়ে খিচুড়ি পাকানো চলবে না। না, কিছুতেই না। কিন্তু এখনো দেখছি সেই খিচুড়ি!"

গণেশ বললে—"আমি সাধুভাষায় লিখেছি স্যার।"

"সাধুভাষায় লিখেছ? এই তোমাব সাধুভাষা?" সীতানাথবাবু গাদার ভেতর থেকে তাব খাতাটিকে উৎখাত কবেন—"কী হয়েছে এ? 'দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল'? দুগ্ধফেননিভের সঙ্গে—"

"কেন স্যার, 'করিয়া' তো লিখেছি আমি? করিয়া কি সাধুভাষা হয়নি স্যার?"

"কিন্তু ধপাস! ধপাস কী ভাষা? দুগ্ধফেনানভের পরেই এই ধপাস?"

গণেশ এবার ফেননিভের মতই নিভে যায়, টুঁ শব্দটি করতে পারে না।

"কতবার বলেছি তোমাদের যে ভাষার খিচুড়ি পাকিয়ো না। হয় সাধু ভাষায়, নয় কথ্য ভাষায়—যেটায় হয় একটাতে লেখো। কিন্তু দেখো, আগাগোড়া যেন এক রকমেব হয়।—গণেশের এই বাক্যটিকে তোমাদের মধ্যে নিখুঁত করে বলতে পার কেউ?"

"পারি স্যার।" মানব উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দাঁড়িয়েই মাথা চুলকোতে লাগল সে। ধপাস-এর সাধুভাষা কী হবে তার জানা নেই। খানিক মাথা চুলকে খানিক আমতা আমতা করে সে নিজেও ধপাস করে বসে পড়ল। তার মানসে যে কী ছিল তা জানা গেল না।

সরিৎ উঠে বলল, "কিসে বলব স্যার? কথ্য ভাষায়, না অকথ্য ভাষায়?"

"যাতে তোমার প্রাণ চায়।"

" 'দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়েস করে বসল।' "

"দুগ্ধফেননিভের সঙ্গে আয়েস?" সীতানাথবাবুর মুখখানা—উচ্ছের পায়েস খেলে যেমন হয় তেমনিধারা হয়ে ওঠে:—"ওহে বাপু! গুরুচণ্ডালী কাকে বলে তা কি তোমাদের মাথায় ঢুকেছে? মনে কর, যে চাঁড়ালটা আমাদের এই ইস্কুল ঝাঁট দেয় সে যদি হেডমাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে একাসনে বসে তাহলে সেটা যেমন দৃষ্টিকটু দেখায়, কতকগুলি সাধুশব্দের মধ্যে একটা অসাধু শব্দ ঢুকলে ঠিক সেই রকম খারাপ দাঁড়ায়। কিন্তু দু'জন চাঁড়াল স্বচ্ছন্দে গলা-ধরাধরি করে যেতে পারে—কারো চোখেই খারাপ দেখায় না। সাধু ভাষার যে শব্দ কথ্য ভাষার শব্দদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে পারে না, সেই কথাই আবার অন্যান্য সাধু শব্দের সঙ্গে মিশ খেয়ে বেশ মানিয়ে যেতে পারে—যেমন উদাহরণ-স্বরূপ—"

"বলব স্যার? এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি।" বলে ওঠে গণেশ: 'দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়াস সহকারে বসিল। কিংবা উপবেশন করিল।' হয়েছে এবার স্যার?"

"কিম্বা আরো বেশি সাধুতা করে আমরা বলতে পারি—" নিরঞ্জন উঠে বলে: " 'আসন গ্রহণ করিল। কিম্বা আসন পরিগ্রহ করিল।' "

দীপক বলে, " 'সমাসীন হইল'ও বলা যায়।"

"আবার তুই এর মধ্যে সমাস ঢোকাচ্ছিস!" গণেশ তার কানের গোড়ায় ফিসফিস করে, "এতেই কেঁদে কূল পাইনে, এর ওপরে ফের সমাস!"

"যেমন উদাহরণস্বরূপ—" সীতানাথবাবু বলতে থাকেন, কিন্তু তাঁর বলার মাঝখানেই পিরিয়ডের ঘণ্টা বেজে যায়। উদাহরণের স্বরূপ প্রকাশের আগেই তাঁকে ক্লাস ছেড়ে যেতে হয়। নিজের

বক্তব্য আরেক দিনের জন্যে মুলতুবি রেখে সমস্ত প্রশ্নটাই আমূল রেখে যান।

দিনকয়েক পরে গণেশ রেশন আনতে গিয়ে দেখল যে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাইও সেই সরকারি দোকানে এসেছেন। লম্বা লাইনের ফাঁকে সীতানাথবাবুও দাঁড়িয়ে। সেই কিউয়ের ভেতর মহল্লার ঝাড়ুদার—নিশ্চয়ই সে চণ্ডাল—যেমন রয়েছে, তেমনি আছে পাড়ার গুণ্ডারা। তারাও কিছু সাধু নয়। বরং তাদের প্রচণ্ডালই বলা যায়। প্রচণ্ড তাদের দাপট। পাড়ার স্যার এবং অসার—সবাই এক সারের মধ্যে সমানে খাড়া। রীতিমত গুরুচণ্ডালী।

সীতানাথবাবু ছিলেন সারির মাঝামাঝি। গণেশ অনেক পরে এসে শেষের দিকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সীতানাথবাবুকে। চণ্ডালের মধ্যে গুরুদেব—ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ এই অভাবিত মিলন-দৃশ্য দেখে সে অবাক হল। সে দৃশ্য অবাক হয়ে দেখবার মতই।

সীতানাথবাবুর দৃষ্টি কোনো দিকে ছিল না। অজগরের মত বিরাট লাইন যেন কচ্ছপের গতিতে এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছিল।

কতক্ষণে রেশন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরবেন, হাঁড়ি চড়িয়ে চান সেরে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে পাড়ি দেবেন ইস্কুলে, সেই ভাবনাতেই সমস্ত মন পড়ে ছিল তাঁর।

সহসা এক বালসুলভ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তাঁর কানে এসে পিন ফোটাল। ফুটতেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন

"স্যার, স্যার! ব্যগ্র হন কল্য! ব্যগ্র হন কল্য!" শুনতে পেলেন তিনি।

শুনেই তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন গণেশকে। কিউয়ের শেষ দাঁড়িয়ে চিৎকার ছাড়ছে।

ব্যগ্র হন কল্য? তার মানে? কেন তিনি ব্যগ্র হবেন? আর হন যদি বা, তো তা কালকে কেন? ব্যগ্র যদি হতেই হয় তো আজকেই কেন নয়? এই মুহূর্তেই বা নয় কেন? আর, এই মুহূর্তে ব্যগ্র হয়েই বা কী হবে? কিউয়ের লাইন তো আর ছেলেদের খাতার লাইন নয় যে পেনসিলের এক খোঁচায় ফ্যাঁশ করে কেটে এগিয়ে যাবেন। যতই তাড়া থাক, যতই ব্যগ্র হন, আগের লোকদের কাটিয়ে এগুবার একটুও উপায় নেই এখানে। ফাঁড়ার মতই অকাট্য এই লাইন।

"স্যার স্যার—পুনরায়। পুনরায়। ব্যগ্র হন কল্য। ব্যগ্র হন কল্য!" আবার সেই আর্তনাদ।

সীতানাথবাবুর ইচ্ছে করে এক্ষুনি গিয়ে বেশ একটু ব্যগ্র ভাবেই গণেশের কানদুটো ধরে মলে দেন আচ্ছা করে। কিম্বা তুলে ধরে এক আছাড় মারেন ওকে। কিন্তু ওকে পাকড়াবার এই ব্যগ্রতা দেখাতে গিয়ে লাইনের জায়গা পা-ছাড়া করার কোনো মানে হয় না।

আস্তে আস্তে এগিয়ে দোকানের ভেতর পৌঁছে রেশনের দাম দিতে গিয়ে তাঁর চোখ কপালের কানায় ঠেকল—যেমন একটু আগে তাঁর কান চোখা হয়ে উঠেছিল। ছাখেন যে, তাঁর পকেট মারা গেছে। পকেটের যেখানে টাকার ব্যাগটা থাকে, সেখানটা ফাঁকা।

বৃথা হৈ-চৈ না করে বিরস মুখে তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন।

"স্যার, তখন আমি কী বলছিলাম? আমি অত করে বললাম, তা আপনি কান দিলেন না। আদৌ কর্ণপাত করলেন না!" গণেশ অনেকটা এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। দোকানের মুখে পৌঁছে মাস্টারের সম্মুখে পড়েছে।

"কী বলছিলে তুমি? তুমি তো আমায় কাল ব্যগ্র হতে বলছিলে। আর এদিকে আমার আজ সর্বনাশ হয়ে গেল!"

"কাল ব্যগ্র হতে বলেছি? মোটেই না। আমি বলছিলাম, 'ব্যাগ গ্রহণ করল'। আপনার পরেই যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই, সেই হতভাগাই পেছন থেকে আপনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে—"

"তা, 'পকেট মারল' বলতে তোর কী হয়েছিল রে হতমুখ্যু?" সীতানাথবাবুর সমস্ত রাগ এখন গণেশের ওপর গিয়ে পড়ে—"সোজাসুজি তা বললে কী হত? তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হত? 'পকেট মারছে স্যার'—বলতে কী আটকাচ্ছিল তোমার পাপ মুখে?"

"ছি ছি!" গণেশ নিজের জিভ কাটে—"অমন কথা বলবেন না স্যার! 'পকেট মারছে'—সে-কথা কি আপনার সামনে আমি উচ্চারণ করতে পারি? 'পকেট প্রহার করছে' বললেও তো শুদ্ধ হয় না। আর বলুন, গুরুমহাশয়ের কাছে অমন চণ্ডালের মতন ভাষা কি বলা যায়? ও কথা—অমন কথা বলবেন না স্যার! 'ব্যাগ গ্রহণ করল' বলেছি—জানি যে তাও সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় নি, গুরুচণ্ডালী একটুখানি যেন রয়ে গেছে; কিন্তু কী করব, ব্যাগের সাধুভাষা যে কী তা তো আমার জানা নেই স্যার! কত করে ভাবলাম, কিন্তু কিছুতেই ব্যাগের শুদ্ধটা আমার মাথায় এল না। এদিকে ভাবতে ভাবতে ব্যাগ-শুদ্ধ নিয়ে সটকাল।"

কল্কে-কাশির কাণ্ড

প্রফুল্ল গোড়া থেকেই বিষণ্ণ মেরে আছে। হ্যাঁ, ভারি তো কাজ! তার জন্যে আবার কল্কে-কাশিকে তার ল্যাজে বেঁধে দেওয়া! হোন না গে তিনি একজন নামজাদা ডিটেকটিভ, (প্রফুল্ল শুনেছিল কোরিয়া অঞ্চলে কল্কে-কাশির মত অত বড় গোয়েন্দা আর নেই।) তবু এই সামান্য একটা মশা-মারার ব্যাপারে অত ভারি কামান কাঁধে বয়ে আনতে প্রফুল্লর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সত্যি, কামস্কাটকা থেকে উনি না এলেও কিছু কাজ আটকাত না।

বোম্বের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁর এক কোনের টেবিলে কল্কে-কাশির মুখোমুখি চপ-কাটলেট-ডেভিল-ডিম-কেক-পুডিংএর সমারোহ সত্ত্বেও তার জিভ সরছিল না। বাস্তবিক, এত বড় অপমান হজম করবার পর খেতে কারু রুচি থাকে?

কিন্তু মিঃ কল্কে-কাশি বেপরোয়া। ডিশের পর ডিশ তিনি সাবড়ে চলেছেন—কাঁটা-চামচের তাঁর কামাই নেই। এক ফাঁকে সামনের ভদ্রলোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। এ কী! কল্কে-কাশি একটু অবাকই হন। একজন খুনে একটার পর একটা দশটা খুন করেছে, নিজের চোখেই এরকম দৃশ্য তাঁর জীবনে একাধিকবার তিনি দেখেছেন কিন্তু বিস্মিত হতে পারেন নি। কিন্তু এক ভদ্রলোক দশ-দশটা প্লেটের সামনে একেবারে নির্বিকার! একদম জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন, একটাকেও কাবু করতে পারছেন না! তাঁর সুদীর্ঘ জীবনস্মৃতির মধ্যে এবম্বিধ কাণ্ড তাঁর স্মরণে পড়ে না।

বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে! কল্কে-কাশির বিরাট বপু-পরিধির তুমুল আন্দোলন (অবশ্য খাবার সময়েই সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ

হয়) অকস্মাৎ থেকে যায়: মাছের চোখের মত ড্যাবডেবে চোখ ঈষৎ প্রসারিত হয়। "প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্লতর হবার পক্ষে কী বাধা হচ্ছে জানতে পারি কি?" তিনি প্রশ্ন করেন।

বাংলাতেই প্রশ্ন করেন। সোজা পরিষ্কার বাংলাতেই। কামস্কাটকার লোক হলে কী হবে, বাংলা, হিন্দি, (এবং কোন-কোন জানোয়ারের ভাষাও) কল্কে-কাশির ভালভাবেই আয়ত্ত। তবে, কামাস্কাটকার ভাষায় তাঁর দখল আছে কি না বলা যায় না। এ বিষয়ে প্রফুল্লর সন্দেহ থাকলেও পরীক্ষক হবার সাহস তার নেই। কেন না সে নিজেও কামস্কাশিয়ানে অজ্ঞ, দারুণ অজ্ঞ।

প্রফুল্ল আরো বেশি গম্ভীর হয়ে যায়; মাথা চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দেয়, "ভাবনায় মশাই, ভাবনায়! কী রকম গুরু দায়িত্ব মাথার ওপরে, বুঝতেই তো পারছেন!"

"বুঝতে পারছি বৈকি," কল্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, "মিঃ ব্যানার্জির কবে এসে ভারতবর্ষে পৌঁছবার কথা, অথচ তিনি কি-এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিলেতে আটকে আছেন। তিনি আসতে পারলেন না। তাঁর সই-করা নমিনেশন পেপার এয়ার-মেলেএ কাল বিকেলে পৌঁছেছে; তাঁর অ্যাটর্নি গলস্টোন কোম্পানির আপিসের জিম্মায় আছে। সেই নমিনেশন পেপার আজই সঙ্গে নিয়ে আমাদের কলকাতা ছুটতে হবে। তবেই আঠারো তারিখের আগে সেই নমিনেশন পেপার ফাইল হতে পারবে। আঠারোই হচ্ছে ফাইলিংএর শেষ দিন। তা নাহলে মিঃ ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হবে না।"

"বিলেতে মিঃ ব্যানার্জির আকস্মিক দুর্ঘটনার মূলে কি কোন রহস্যজনক কারণ আছে আপনি আশঙ্কা করেন? প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করে।

কল্কে-কাশি এর জবাব দেন না। "এই নমিনেশন পেপার ডাকে পাঠানো নিরাপদ নয়। কোন কারণে একদিন কিম্বা কয়েক

ঘণ্টা লেট হলেই সমস্ত পণ্ড—তার চেয়েও বড় আশঙ্কা হচ্ছে নমিনেশন পেপার মারা যাবার।"

"মারা যাবার!" প্রফুল্ল চোখ প্রকাণ্ড হয়, "কেন, নমিনেশন পেপার মেরে কার কী লাভ? ও কি মার্তব্য জিনিস?"

"হ্যাঁ, ডাকে পাঠালে, এমনকি রেজিস্ট্রি করে ইনশিওর করে পাঠালেও যথাস্থানে যথাসময়ে যথাযথ জিনিসটা পৌঁছবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কার কী লাভ আপনি জিজ্ঞাসা করছেন? বাংলা দেশে দুটি দল আছে আপনি জানেন?"

"উঁহু", প্রফুল্লর বলে, "জানি না তো।"

"এই দুটি দলই কাউন্সিলে ঢুকতে. চায়। দু-দলে ভয়ানক রেষারেষি। কাউন্সিলে যে-দল ভারি হতে পারবে তাদেরই সারা বাংলায় আধিপত্য হবে কিনা। একটি দলের নাম হচ্ছে ফ্লু-ফ্লুকস-ফ্যান—যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খেলে আর ফ্যানের তলায় হাওয়া খায় তারা মিলেই এই দল গড়েছে; আমেরিকার বিখ্যাত ক্লু-ক্লুকস-ক্ল্যানের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই, একমাত্র নামের কতকটা সমিল ছাড়া।"

"বটে।" প্রফুল্ল নিশ্বাস পড়ে কি পড়ে না। "আরেকটা দল কারা?"

"মিঃ ব্যানার্জি হচ্ছেন এই ফ্লু-ফ্লুকস-ফ্যান-এর পাণ্ডা। অন্য দলের নাম হচ্ছে বাই হুক অর ক্রুক। এই বাই হুক অর ক্রুক পার্টির নেতা হচ্ছেন মিঃ সরকার। যেমন করেই হোক নিজের মতলব সিদ্ধ করতে এঁরা সিদ্ধহস্ত।"

"আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সরকারি চালে মিঃ ব্যানার্জি বিলেতে আটকে পড়েছেন?"

"আপাতত আমি ঐ কোনের লোকটার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।" কল্কে-কাশি চোখ টিপে ইসারা করেন।

এতক্ষণে কল্কে-কাশির ওপরে প্রফুল্লর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। সত্যি, অনেক খবর রাখেন ভদ্রলোক। এইজন্যে অপর দিক থেকে সহসা 'তুমি' সম্বোধনেও সে অপ্রসন্ন হতে পারে না, কল্কে-কাশির ইঙ্গিতের অনুসরণ করে সে।

"ঐ যে কাটখোট্টা-গোছের চেহারা, মাথার চুল ক্রপ করা, চোখে কুটিল ভঙ্গি, ঐ কোনের ছোট্ট টেবিলে বসে অমলেটের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে—ওকে লক্ষ্য কর, সহজেই বুঝতে পারবে। এ-রকম ফ্যাশনেবল রেস্তরাঁয় গতিবিধি ওর স্বভাবসিদ্ধ নয়, কাঁটা-চামচের কসরতে এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। খাদ্যের সঙ্গে কাটাকাটি নয়, হাতাহাতিতেই ও পরিপক্ক। উনি এখানে এসেছেন তোমার অনুসরণ করে।"

"আমার!" প্রফুল্লর বিশ্বাস হয় না, "তার মানে?"

"একটু কায়দা করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, চোখ অমলেটের দিকে থাকলেও মনোযোগ ওর আমাদের দিকেই। কলকাতার একটি বিখ্যাত চীজ—ওর মতো কৌশলী এবং ভয়লেশহীন ভদ্র-গুণ্ডা আর দুটি আছে কি না সন্দেহ। ঐ শ্রেণীর ক্রিমিন্যাল ব্রেনের আমেরিকায় জোড়া মিলতে পারে, কিন্তু এদেশে দুর্লভ। মিঃ ব্যানার্জির পার্টি আমাকে যে তোমার সঙ্গে দিয়েছেন, উনিই হচ্ছেন তার একমাত্র কারণ।"

প্রফুল্লর সহজে বাক্যস্ফূর্তি হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে বলে, "ওর নাম?"

"ওর নাম হচ্ছে সমাদ্দার, ওরফে সমরেশ ঠাকুর, ওরফে গোপাল হাজরা, ওরফে নটেশ্বর রায়, ওরফে পোড়া গণেশ, ওরফে আরো এক ডজন। প্রেসিডেন্সি জেল আর হরিণবাড়ির ফেরতা। আমার সঙ্গে ওর অনেক দিনের পরিচয়,—অনেকটা হৃদ্যতার সম্বন্ধই বলতে পার। এই কারণে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে ও একটু

সঙ্কোচ বোধ করছে, নইলে ও এতক্ষণে তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না।"

প্রফুল্ল চমকে ওঠে—"বলেন কী মশাই!"

"ঐ রকমই।" কল্কে-কাশি যৎসামান্যই হাসেন। "সরকারের দল ওকে লাগিয়েছে তোমার পেছনে, ব্যানার্জির নমিনেশন পেপার নিয়ে তুমি যথাসময়ের আগে যথাস্থানে যাতে না পৌঁছতে পার সেইজন্যেই। এজন্যে তোমাকে খুন করতেও ও পেছপা হবে না; তবে, কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেই ও ভালবাসে—খুনোখুনি করার তেমন পক্ষপাতী নয়। এ-বিষয়ে একটু সুরুচিই আছে লোকটার।"

প্রফুল্ল আশ্বস্ত হতে পারে না—"আপনি কেন ওকে অ্যারেস্ট করছেন না তাহলে? গ্রেপ্তার করে ফেলুন! এক্ষুনি!"

"এখন পর্যন্ত ও কোনো অপরাধ করে নি, কেবল মনের মধ্যে এঁচেছে মাত্র এবং মনে আঁচার জন্যেই যদি গ্রেপ্তার করা শুরু করতে হয় তাহলে এত লোককে ধরতে হয় যে জেলে তার জায়গা কুলোবে কি না সন্দেহ। কেবল মনের মধ্যেকার প্ল্যানের জন্যে কাউকে তো জেলে পোরা যায় না!"

"তাহলে—তাহলে তো ভারি মুস্কিল!" প্রফুল্ল ভীতই হয়, বলে—"আমাকে খুন করে ফেলবে তবে?"

"যদি করেই ফেলে, তখন—হ্যাঁ, তখন ওকে ধরে ফেলতে আমার বিলম্ব হবে না, যদি নিতান্তই পালিয়ে না যায়। তবে, সমাদ্দারের সঙ্গে আমার হৃদ্যতারই সম্বন্ধ; আমাকে দেখে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তোমাকে একেবারে খতম করবে না। ভয় কী তোমার?"

বিশেষ ভরসাও পায় না প্রফুল্ল।

"এজন্যেই বলছিলাম, ভয়ানক গুরু দায়িত্ব তোমার মাথায়। যদি নমিনেশন পেপার নিয়ে আঠারোই এগারোটার মধ্যে

কলকাতায় না পৌঁছতে পার তাহলে ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হল না—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের দফাও রফা। মিঃ সরকারের দলেরই একছত্র আধিপত্য হবে কাউন্সিলে, মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও দখল করে বসবেন তাঁরাই। সামান্য একটা সই-করা কাগজের ওপরে একটা পার্টির কতখানি নির্ভর করছে ভেবে দেখ। সে যে-সে পার্টি নয়, ফ্লু ফ্লুকস ফ্যান!"

"অর্থাৎ আপনার ভাষায়, যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, বেস খেলে—ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো এদের দলের কেউ নই। বিন্দুবিসর্গও জানি না। আমাকে এই মারাত্মক কাজে পাঠাবার মানে?" প্রফুল্ল বিরক্তিই প্রকাশ করে।

"তার মানে, তুমি যে-আপিসের কেরানি তার বড়কর্তা ঐ দলের একজন হোমরা-চোমরা। তিনি তো ফ্যানের হাওয়া খান, তাহলেই হল। এসব কাজে অজ্ঞ এবং আনাড়িকে পাঠানোই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত, নাড়িজ্ঞান-ওয়ালা লোক অনায়াসেই অন্য দলের ঘুস খেয়ে—বুঝতেই পারছ! তাছাড়া, তোমার ওপর ওদের বিশ্বাস আছে। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ তোমার ওপর দেওয়ায় সেটা প্রমাণ হয়না কি?"

"আমার গায়ে জোরও যথেষ্ট!" প্রফুল্ল কোটের হাতা তুলে মাসল কণ্ট্রোল করে কল্কে-কাশিকে দেখায়—"সহজে যে কেউ আমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবে তা প্রাণ থাকতে নয়।"

"এস সমাদ্দারের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই"—কল্কে-কাশি প্রফুল্লকে আহ্বান করেন, "কী ছুতোয় যে গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাবে ভেবে ভেবে কাহিল হয়ে উঠছে বেচারা।"

"ওর সঙ্গে আলাপ!" দারুণ বিস্মিত হয় প্রফুল্ল, "বলেন কী!"

"ক্ষতি কী তাতে? গিলে ফেলবে না তোমায়।" কল্কে-কাশি প্রফুল্লকে টেনে নিয়েই চলেন, "এই যে সমাদ্দার! অনেক দিন পরে দেখা—কেমন, ভাল আছ তো?"

সমাদ্দার চমকে ওঠে, "মিঃ কল্কে-কাশি যে! এখানে এখন এইভাবে আপনাকে দেখতে পাব আশা করিনি।"

"আমি কিন্তু আশা করেছিলাম, পরশু সন্ধ্যায় আমাদের বোম্বে মেলে যখন তোমাকে উঠতে দেখলাম।"

"বটে?" সমাদ্দার যেন একটু অপ্রস্তুত হয়, "আপনারা তাহলে আজ সকালেই বোম্বে পৌঁছেছেন? ইনি আপনার বন্ধু বুঝি?"

"হ্যাঁ, এই একটু আগেই। নেমে এই রেস্তোরাঁতেই প্রাতরাশের চেষ্টা করেছিলাম। এমন সময়—হ্যাঁ, কী জিজ্ঞাসা করছিলে? ইনি? ইনি হচ্ছেন বাবু প্রফুল্লকুমার রায়,—কেন যে এঁর বোম্বে আগমন তা তো তোমার ভালমতই জানা আছে।"

"আমার?" সমাদ্দার থতমত খায়, "না তো! তবে, ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলে বিশেষ আপ্যায়িত হব।"

"তা তো হবেই! হবার কথাই। বেশ, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু প্রফুল্লবাবু, আর ইনি হচ্ছেন সমাদ্দার, আমার বন্ধু। অন্তত আমার শত্রু নন। এঁর পরিচয় তো টেবিলে বসেই তোমাকে দিয়েছি। প্রফুল্ল, তুমি সমাদ্দারকে নমস্কার করলে না? প্রথম পরিচয়ে নমস্কার করাই তো ভদ্ররীতি।"

প্রফুল্ল আর সমাদ্দার বোকার মতো পরস্পরকে প্রতি-নমস্কার করে। "সুখী হলাম প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আলাপিত হয়ে।" সমাদ্দার বলে।

"হবেই তো!" কল্কে-কাশি যোগ করেন, "নিশ্চয়! এইজন্যেই কি কলকাতা থেকে এতটা তোমাকে আসতে হয় নি? বল? ভাগ্যিস আমি ছিলাম এখানে! বন্ধু-বান্ধবের উপকার করতে কখনই আমি পেছপা নই বলেই তোমাদের আলাপ করিয়ে দিলাম।"

"সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মিঃ কল্কে-কাশি!" সমাদ্দার বিস্ময়ের ভান করে, "কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"সত্যি বলছ?" কল্কে-কাশি আকাশ থেকে পড়েন। "আমার সঙ্গে তুমি জোচ্চুরি করবে বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

"সত্যি, আপনার কথার কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। এখানকার একটা ফিল্ম স্টুডিয়োয় চাকরির চেষ্টাতেই আমার বোম্বে আসা।"

"তাই নাকি? তবু তোমাকে বলে রাখছি, যদি তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমার কথাগুলো কাজে লাগবে। এখান থেকে প্রফুল্লবাবু যাবেন গলস্টোন কোম্পানির আপিসে। সেখানে তাঁর কি কাজ আছে। আমি অবশ্য ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি না। আরেকটা জরুরি খবর, আমরা উঠেছি তাজমহল হোটেলে। তারপব আজ রাত্রের গাড়িতেই আমবা ফিরছি কলকাতা। আচ্ছা এখন আসা যাক, হোটেলেই আমাদেব আবার সাক্ষাৎ হচ্ছে আশা করি?"

হতভম্ব সমাদ্দারের কাছ থেকে দুজনে বেরিয়ে আসেন। প্রফুল্ল অসন্তোষ প্রকাশ করে—"মিঃ কল্কে-কাশি! আপনি একজন খুব বড় গোয়েন্দা হতে পারেন—"

"উঁহু উঁহু, আদৌ না! এই বরাতের জোবেই যা কবে খাচ্ছি।"

"কিন্তু আপনি কি অনেক গুপ্ত সংবাদ ওকে দিয়ে দিলেন না?"

"কাকে? সমাদ্দারকে?" কল্কে-কাশি অবাক হন, "কি রকম?"

"এই আমার গলস্টোন আপিসে যাবার খবব, এবং তাজমহল হোটেলে ওঠার কথা। তারপর আজ রাত্রেই কলকাতা-মেলে ফেরা—"

"কেন, কী হয়েছে তাতে? ওর কত কষ্ট লাঘব হয়ে গেল! বেচারাকে এসব খুঁজে বের করতে আর হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।"

"সেটা কি ভাল হল ?" প্রফুল্ল বিরক্তি চাপতে পারে না।

"আহা! বুঝতে পারছ না ? যতই ওকে কম হাঙ্গামা পোহাতে হবে, ততই বেশি ও ভাববার সময় পাবে। আর যতই ও ভাবতে পাবে ততই নিজের কাজ মাটি করবে তা জানো ?"

অতঃপর প্রফুল্ল কল্কে-কাশির কাছে বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে। একটু পরেই আরেকখানা ট্যাক্সি প্রফুল্লর গাড়ির পিছু নেয়—এই ট্যাক্সিটা সমাদ্দারের। পরমুহূর্তেই আরো একখানা গাড়ি দূর থেকে দুজনের অনুসরণ করে চলে—এ গাড়িতে আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীযুক্ত কল্কে-কাশি মহাশয়।

তিনখানি গাড়িই অনেক ঘুরে-ফিরে শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয় চারধারে বাগানঘেরা প্রকাণ্ড এক বাড়ির ফটকে। গলস্টোন কোম্পানির বড়সাহেবের রেসিডেন্স। প্রফুল্লর গাড়ি ফটকের ভেতর ঢোকে। একটু দূরে সমাদ্দারের গাড়ি থামে—কল্কে-কাশির গাড়ি দ্বিতীয় গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ যেন থেমে যায়।

"সমাদ্দার মশাইকে এখানে এ অবস্থায় দেখব আশা করতে পারিনি।" কল্কে-কাশি বলেন। তাঁর মুচকি হাসিও লক্ষ্য করবার।

"এই, একটু শহর দেখতে বেরিয়েছি!" সমাদ্দার থতমত খায়, "হাওয়া খেতেও বটে!"

"শহর দেখতে শহরের বাইরে ? মন্দ নয়! ফিল্ম আর্টিস্টের কাজটা তোমার পাকা তাহলে!" কল্কে-কাশি গলা পরিষ্কার করেন, "আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম, যাচাই করে নিতেই এতদূর আশা। যাক, আমার কাজ আছে। শহরেই আমি ফিরলাম।" তারপর একটু হাসেন, "হ্যাঁ, হয়ত তোমার জানাই আছে, তবু খবরটা তোমাকে দিয়ে রাখাই ভাল। ঐ বাড়িটাই মিঃ গলস্টোনের—ব্যানার্জির নমিনেশনের কাগজপত্র আনতে প্রফুল্লবাবু ওখানেই গেছেন। ছাখো চেষ্টা করে যদি তোমার

বরাত খুলে যায়! বন্ধুবান্ধবের শুভাকাঙ্ক্ষা করাই আমার দস্তুর, জানোই তো!"

কল্কে-কাশির গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যে পথে এসেছিল সেই দিকেই ফিরে চলে। সমাদ্দার কোন জবাব দিতে পারে না।

তারপরে আরেক ঘণ্টা সমাদ্দারকে অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে প্রফুল্লর গাড়ি বাইরে বেরোয়। সমাদ্দারের আবার অনুসরণ। প্রফুল্লর ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় তাজমহল হোটেলের সামনে। সমাদ্দারেরও। প্রফুল্ল নেমেই ট্যাক্সিওয়ালার পাওনা চুকিয়ে সটান তের নম্বর ঘরে ঢুকেই খিল আঁটে। সমাদ্দার গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত করে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কল্কে-কাশির অভ্যুদয় হতেই প্রফুল্ল রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটে যায়—"সর্বনাশ হয়েছে, মিঃ কল্কে-কাশি!"

কল্কে-কাশি কিছুমাত্র বিচলিত হন না—"কী সর্বনাশ?"

"সমাদ্দার এসে উঠেছে এখানে! আমাদের পাশের বারো নম্বর ঘরে!"

"তাই নাকি? তাহলে তো ওকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করতে হচ্ছে! আমিও ওর শুভাগমন আশা করছিলাম।"

কল্কে-কাশি রসিকতা করছেন, প্রথমটা প্রফুল্ল তাই ভেবেছিল; কিন্তু সত্যিই ডিনারের টেবিলে সমাদ্দারের পাশে বসে নিজের চক্ষু-কর্ণকে ওর বিশ্বাস করতে হল। ওর চিরকালের ধারণা, গোয়েন্দায় আর বদমাইসে মুখোমুখি হলেই ঝটাপটি বেধে যায়। শেষোক্তরা স্বভাবতই পলায়ন-তৎপর এবং প্রথমোক্তরা সর্বদাই ওদের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যতিব্যস্ত। মাসিক পত্রের পাতায় আর গোয়েন্দা-গ্রন্থমালার বইয়ে পড়ে এই রকমের একটা বিশ্বাস ওর বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু এখন ওদের পরস্পরকে অন্তরঙ্গের মত কথাবার্তা কইতে দেখে তার সে ধারণা দস্তুরমত টলে গেল।

মধ্যাহ্নভোজ প্রফুল্লর মাথায় উঠে গেল, সে মাঝে মাঝে তার

কোটের বুকপকেটে হাত দিয়ে গুরুতর বস্তুটির অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগল। যে কাগজের টুকরোটির ওপর একটা পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাকে সে যত্নের সহিত কোটের লাইনিংএর মধ্যে সেলাই করে রেখেছে। জিনিসটার সেখান থেকে অকস্মাৎ উবে যাবার কথা নয় কিছুতেই, তবু সে বারম্বার পরীক্ষা করে আপনাকেই যেন ভরসা দিতে চাচ্ছিল।

ওর হস্তচালনা কল্কে-কাশির নজরে পড়ে একবার। তিনি হাসতে থাকেন—"ভয় নেই প্রফুল্লবাবু! ও নিরাপদেই আছে, এবং থাকবেও, যদি না তোমার কোট তুমি খোয়াও।"

কল্কে-কাশির কথায় প্রফুল্লর ভারি রাগ হয়, তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। কল্কে-কাশি তা বুঝতে পারেন।

"আমি কি কোন গুপ্তকথা ফাঁস করে দিলাম নাকি? মোটেই না, প্রফুল্লবাবু! সমাদ্দার জানত যে কোথায় তুমি নমিনেশন পেপার রেখেছ।—কী হে সমাদ্দার, জানতে না?"

সমাদ্দার ঘাড়ে নাড়ে—"নিশ্চয়ই! কোটের লাইনিং, ঐখানেই তো রাখবার জায়গা! সকলেই রাখে এবং সকলেই জানে।"

গোয়েন্দা এবং বদমাইস দুজনে মিলে অকপটে হাসতে থাকে। প্রফুল্ল ভারি মুষড়ে যায়। হতে পারে কোটের লাইনিংই মূল্যবান কাগজ-পত্র রাখার একমাত্র জায়গা এবং সকলেই তা জানে, তবু কী দরকার ছিল মিঃ কল্কে-কাশির সমাদ্দারকে এই খবরটা দেবার? বরং যাতে সমাদ্দারের মনে এরকম সন্দেহ না জাগে বা জেগে থাকলেও তা দূর হয় সেই চেষ্টা করাই কি তাঁর উচিত ছিল না? কল্কে-কাশির গোয়েন্দাপনায় সে ঘাবড়ে যায় সত্যিই।

যাক, প্রফুল্লর আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। যতক্ষণ সে জেগে আছে ততক্ষণ তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া কারো ক্ষমতার বাইরে—এবং রাত্রে, রেলগাড়িতে, হয় সে গা থেকে কোট খুলবেই না, আর খোলেও যদি, তাহলে বালিসের মতই সেটাকে ব্যবহার

করবে, সে ঠিক করে রাখল। তার ভারি সজাগ ঘুম, তার মাথার তলা থেকে কোট নেয় কার সাধ্য!

খাওয়া শেষ হলে কল্কে-কাশি বলেন—"এসো সমাদ্দার, একটু দাবা খেলা যাক। প্রফুল্ল, জানো নাকি দাবা খেলা?"

"জানি সামান্যই।" প্রফুল্ল মুখ গোঁজ করে বলে।

"আমার আপত্তি নেই।" সমাদ্দার উত্তর দেয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা বেশ জমে ওঠে। কল্কে-কাশি ও সমাদ্দারের তো ভালই জানা আছে; প্রফুল্লও নেহাৎ কম যায় না। ক্রমশই ওর উৎসাহ বাড়তে থাকে, সমাদ্দারের চাল কেড়ে নিয়ে নিজে চাল দেয়। প্রফুল্ল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ওর গরম বোধ হয়, ও কোট খুলে ফেলে—সমাদ্দারের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওর হুঁসই নেই তখন। সমাদ্দারও নিজের কোট খোলে এবং প্রফুল্লর কোটের পাশেই রাখে। খেলা চলতে থাকে।

খানিক বাদে সমাদ্দার উঠে পড়ে—"প্রফুল্লবাবু, আপনি ততক্ষণ মিঃ কল্কে-কাশির সঙ্গে একটু খেলুন। আমি আসছি এক্ষুনি।"

একটু পরেই সমাদ্দার ফিরে আসে—"প্রফুল্লবাবু, ভুল করে নিজের কোট ফেলে আপনার কোট নিয়ে গেছি, কিছু মনে করবেন না!" কোট খুলতে খুলতে সে বলে।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে ওঠে, নিজের কোট কেড়ে নেয়' যেখানে নমিনেশন পেপার ছিল সেখানটা অনুভব করে। পরমুহূর্তেই সে সমাদ্দারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। কল্কে-কাশি মাঝে পড়ে বাধা না দিলে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বদমাইসটাকে হয়ত সেইদণ্ডে টুঁটি টিপে খুন করে বসত।

"প্রফুল্লবাবু করছ কী? কী ব্যাপার?"

"ঐ চোর—'

"আহা, গালাগালি কেন? কী হয়েছে?"

"আপনি বুঝতে পারছেন না। এই লোকটা এইমাত্র আমার কোট থেকে নমিনেশন পেপার চুরি করেছে।"

কল্কে-কাশি তেমনিই অবিচলিত থাকেন—"তাই নাকি হে সমাদ্দার? তাই নাকি?"

"প্রফুল্লবাবু তো সেই রকমই ভাবছেন।" সমাদ্দার বলে, "কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কখন করলুম!"

সমাদ্দার উচ্চহাস্য করে, কল্কে-কাশিও হাসতে থাকেন। প্রফুল্ল রেগে আগুন হয়ে ওঠে, কিন্তু একা সে কী করবে? আপন মনেই সে ফুলতে থাকে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার কেমন-কেমন ঠেকে। সমাদ্দার ও কল্কে-কাশির মধ্যে যে-রকম অন্তরঙ্গতা তাতে ওর নিদারুণ সন্দেহ হতে থাকে। ওরা দুজনে মাসতুতো ভাই নয় তো?

"তুমি যদি এখুনি আমার কাগজ না ফিরিয়ে দাও তোমার হাড় ভেঙে আমি ছাতু করব।" প্রফুল্ল ঘুসি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়।

"আহা, হচ্ছে কী এসব! মারামারি কি ভদ্রলোকের কাজ?" কল্কে-কাশি ওকে সামলাতে যান।

"আপনি থামুন মশায়! আপনারা এক গোত্র! আমি বেশ বুঝেছি! গাড়িতেই ধরতে পেরেছিলাম, কিন্তু—সে যাক। আপনার কোনো কথা আমি শুনছি না আর!" প্রফুল্ল মরিয়া হয়ে ওঠে।

এবার সমাদ্দার কথা বলে—"আপনি যদি আমার গায়ে হাত দেন প্রফুল্লবাবু, তাহলে আমি এক্ষুনি হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে আপনাকে পুলিশে দেব। আপনার কাগজ যে আমি নিয়েছি তার প্রমাণ কী?"

"বেশ, আমি তোমাকে সার্চ করব! তোমার কামরাও!"

"স্বচ্ছন্দে। এক্ষুনি।" সমাদ্দার কল্কে-কাশির দিকে ফেরে, "আপনিও কি সার্চ করতে চান? আসুন আমার সঙ্গে, কোনো আপত্তি নেই আমার!"

"বাজে কাজে সময় নষ্ট করি না আমি"—কল্কে-কাশি একটা সিগারেট ধরান। "তুমি যদি সত্যিই ও-কাগজ নিয়ে থাক সমাদ্দার, তাহলে এখন তোমাকে সার্চ করে কোনো লাভ নেই। কোথায় তুমি তা রেখেছ তাই যদি ভেবে বার করতে পারি, তাহলে তা পেতে আমার বিলম্ব হবে না।"

"আপনি কি তাহলে সার্চ করতে প্রস্তুত নন?" প্রফুল্ল এবার ক্ষেপে ওঠে।

"উহুঁ!" কল্কে-কাশির সংক্ষিপ্ত জবাব। "আপাতত না।"

"বেশ, আমি নিজেই করব তাহলে!"

প্রফুল্ল সমাদ্দারের ঘরে যায়, ওর আপাদমস্তক অনুসন্ধান করে, সবগুলো জামার ভেতরের বাইরের সমস্ত পকেট হাতড়ায়, কোটের যাবতীয় লাইনিং পরীক্ষা করে; অবশেষে মুহ্যমানের মত যখন নিজের কামরায় ফেরে তখন কল্কে-কাশি জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। মুখ না ফিরিয়ে তিনি বলেন—"তখনই বললাম, প্রফুল্লবাবু,—এখন ওকে সার্চ করে কোনই ফল নেই। কোথায় ও জিনিসটা সরিয়েছে যতক্ষণ তাই না আন্দাজ করতে পারছি—"

সমাদ্দার ফিরতেই কল্কে-কাশির কথায় বাধা পড়ে। প্রফুল্ল কোন জবাব দেয় না। নিজের মধ্যে নিজেই সে নেই তখন, এতই দমে গেছে।

"তবে সত্যি বলতে কী, দোষ তোমার নিজেরই প্রফুল্লবাবু! তুমিই বল, তোমার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল কি না?" কল্কে-কাশি কথাটা শেষ করেন।

কিন্তু এ-কথায় প্রফুল্লর এখন আর সান্ত্বনা কোথায়? সে গুম হয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কল্কে-কাশি সমাদ্দারকে বলেন—"ভারি দমিয়ে দিয়েছ তুমি বেচারাকে! ওর মুখ দেখলে মায়া হয়!"

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে। স্বভাবতই সে কোমল-হৃদয়, সত্যিসত্যিই দুঃখ হয় ওর। "বিজনেস, মিস্টার কল্কে-কাশি!" সে বলে।

"সে কথা হাজার বার! কিন্তু ভেবে দেখ দিকি কী সর্বনাশ হল ওর! হয়ত চাকরিই থাকবে না আর। ও তো ভেঙে পড়েছেই, আমিও খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছি না।' কল্কে-কাশি সমাদ্দারের চোখের ওপর চোখ রাখেন—"কাগজখানা রাখলে কোথায় হে সমাদ্দার?"

সমাদ্দার হাসে—"আমি যে রেখেছি আমি তো স্বীকার করিনি!"

"না। এবং তোমাকে স্বীকার করতেও বলছিও না। কিন্তু এ কথাও ঠিক, ও-কাগজ নিয়ে সটকাতে পারছ না তুমি। হাওড়ায় নেমেই আমি তোমাকে আটকাব এবং খানাতল্লাসি করাব—যাকে বলে পুলিসের খানাতল্লাসি।"

সমাদ্দার আতঙ্কিত হয়। "সেটা কি সঙ্গত হবে মিঃ কল্কে-কাশি? কাগজখানা যে আমার কাছে আছে তার বিন্দুমাত্র প্রমাণও আপনি পাননি।"

"না পাই। কিন্তু কাগজখানা আমি পেতে চাই।"

কল্কে-কাশির সঙ্কল্প শুনে সমাদ্দারের শঙ্কা হয়। সে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে যায়, গিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অনেক ভেবে সে একটা উপায় আবিষ্কার করে। দরজায় খিল আঁটে। তারপর নিজের সুটকেস বার করে এক কোনের একটা গুপ্ত বোতাম টেপে, তার ফলে ডালার দিকে একটা লুকোনো খুপরি খুলে যায়। তার ভেতর থেকে সদ্য-অপহৃত নমিনেশন পেপার বেরিয়ে পড়ে।

সমাদ্দার কাগজটা পরীক্ষা করে। সেই সঙ্গে আরেকখানা অনুরূপ নমিনেশন পেপারও। দ্বিতীয় কাগজখানা ফাঁকা, এখানা তাকে দেওয়া হয়েছে আসল কাগজ চেনার সুবিধের জন্য। সমাদ্দার দ্বিতীয় কাগজের যথাস্থানে প্রথম কাগজের দেখাদেখি

ব্যানার্জির সই নকল করে বসিয়ে দেয়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে একই কাগজ, হুবহু একই সই—কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেই এ সই যে জাল-করা তা স্পষ্টই ধরা পড়ে যাবে।

অবশেষে জাল কাগজখানা গুপ্ত ডালার মধ্যে এঁটে রেখে, আসল কাগজটা একখানা লেফাফায় ভরে। খামের ওপরে লেখে মিঃ সরকারের নাম আর ঠিকানা। কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে রেজিস্ট্রি করে পাঠানোই সে সমীচীন মনে করে। ডাকে গেলেও তার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছবে এবং একেবারে তার নিয়োগকর্তার হাতেই, সুতরাং তার অসুবিধের কিছু নেই। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে, কাছাকাছি পোস্ট-আপিসের উদ্দেশে সে রওনা হয়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢোকে। আপন মনেই যেন বলে, "দরজায় তালা লাগিয়ে সমাদ্দারকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।"

"তাই নাকি?" কল্কে-কাশি সিগারেটের সামান্য অবশেষটা ফেলে দেন, "তাহলে তো ওর ঘরটা একবার তল্লাস করতে হয়। এই তো সেরা সুযোগ।"

সব-খোল চাবির সাহায্যে সহজেই তালা খুলে যায়। প্রফুল্লকে নিয়ে তিনি ঢোকেন।

"কোথায় তুমি খুঁজছিলে?"

তদুত্তরে প্রফুল্ল তার অনুসন্ধান বৃত্তান্ত প্রকাশ করে।

"এই সুটকেসটা দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। ওর ভেতরেও দেখেছি। ওতে নেই।"

"দেখেছ ঠিকই, কিন্তু আরেকবার দেখা যাক।"

কল্কে-কাশি সুটকেসটাকে উন্মুক্ত করেন। ভেতরের যা কিছু জিনিস-পত্র সব তাঁর পায়ের কাছে উজাড় হয়।

"দেখলেন তো! বললাম ওতে নেই!" প্রফুল্ল বলে।

কল্কে-কাশি ওর কথায় কান দেন না। খুঁজতে খুঁজতে সেই

গুপ্ত বোতাম আবিষ্কৃত হয়। "পেয়েছি প্রফুল্লবাবু, এতক্ষণে পেয়েছি।"

"কী?"

"এই দেখ।" চাবি টিপতেই সেই লুকোনো ডালা ব্যক্ত হয়। তার মধ্যে একটা লম্বা লেফাফা। লেফাফাটা না খুলেই তিনি প্রফুল্ল হাতে দেন। "এই নাও। কিন্তু সাবধান, আর যেন খোয়া না যায়।"

প্রফুল্ল কম্পিত হাতে লেফাফা খোলে। কাগজখানা দেখেই সে লাফিয়ে ওঠে। তারপর দু'হাতে কল্কে-কাশির একখানা হাত চেপে ধরে—"আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম, আমাকে মাপ করুন—"

উত্তরে কল্কে-কাশির শুধু একটু মৃদু হাসি দেখা যায়। সমস্ত জিনিস যথাযথ রেখে তেমনি তালা এঁটে তাঁরা বেরিয়ে আসেন।

সমাদ্দার হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে কল্কে-কাশির কাছে। "এটা কি ভাল কাজ আপনার মশাই? আমার অবর্তমানে আমার ঘরে গিয়ে সুটকেস খুলে—"

কল্কে-কাশি বাধা দেন—"আমরাই যে তোমার সুটকেস খুলেছি তার কী প্রমাণ তুমি পেয়েছ? প্রমাণ ছাড়া তুমি তো চল না সমাদ্দার!"

প্রফুল্ল এতক্ষণে মন খুলে হাসতে পারে।

সমাদ্দার গজরাতে থাকে, ভয়ানক রাগের ভান করে, কিন্তু সেও মনে মনে হাসে।

আর মিঃ কল্কে-কাশি? তাঁর মুখে হাসি দেখা যায় না।

সমাদ্দার চলে গেলে প্রফুল্ল মুখ খোলে—"একবার বাগাতে পেরেছে, আর পারবে না। এ-কোট আর আমি গা থেকে খুলছি না। রাত্রেও না।"

"ঠেকে শেখা ভয়ানক শেখা প্রফুল্লবাবু!" কল্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, "এবং একবারই একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।"

"আচ্ছা মিঃ কল্কে-কাশি, সুটকেসটায় যে একটা গোপন খুপরি আছে কী করে আপনি বুঝলেন ?"

"তোমার কোটের লাইনিং আছে যেমন করে সমাদ্দার বুঝেছিল।" কল্কে-কাশি ব্যাখ্যা করে দেন—"ও থাকতেই হবে। তোমার কি ডিটেকটিভ উপন্যাস একেবারেই পড়া নেই প্রফুল্লবাবু ?"

প্রফুল্ল নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করতে লজ্জা পায়। একেবারেই যে এক-আধখানা ওর পড়া নেই তা নয়, তবু সে সসঙ্কোচেই বলে—"এবার থেকে পড়ব কিন্তু।"

কলকাতা ফেরার পরদিনই কল্কে-কাশি সমাদ্দারের আড্ডায় গিয়ে আবির্ভূত হন। "আসতে পারি ভেতরে ?"

"আসুন, আসুন! আমার কী সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন!" সমাদ্দার শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

"সরকারদের কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে গেছ তো ?" কল্কে-কাশি জিজ্ঞাসা করেন।

"হ্যাঁ, কালই দিয়ে দিয়েছে। নগদ পাঁচটি হাজার।" সমাদ্দার উত্তর দেয়, "কেন, কী হয়েছে তার ?"

"না, এমন কিছু না।" কল্কে-কাশি তাঁর হাত-ঘড়ির দিকে তাকান। "এখন দশটা, আর এক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্সি কোর্টে নমিনেশন পেপার দাখিল হবে কিনা! তোমাকে আমি কেটে পড়তে বলতে এসেছি। বন্ধুবান্ধব হিসেবেই বলতে এসেছি অবশ্যি।"

"কেটে পড়ব ? আমি! কেন ?" সমাদ্দার সচকিত হয়।

"সরকারদের পার্টির কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছ এইজন্যে। ওদের হাতে খুনে গুণ্ডা তো কম নেই, যাদের তুলনায় তুমি আস্ত দেবদূত!"

"ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি কী রকম ?" সমাদ্দার এবার হাসে,

"আপনি কি এখনো বুঝতে পারেন নি মিস্টার কল্কে-কাশি, আমার সুটকেস থেকে যে কাগজ আপনি বের করে নিয়েছিলেন তা আসলে জাল সই করা?"

"আগাগোড়াই তা আমি জানতাম।" কল্কে-কাশির গলার স্বর গম্ভীর।

"তবে?"

"আসলে একটা কথা তুমি নিজেই এখনো বুঝতে পার নি সমাদ্দার। প্রফুল্লর পকেট থেকে যে কাগজ তুমি বাগিয়েছিলে তাও জাল ছাড়া কিছু না।"

"অ্যাঁ?" এবার সত্যিই চমকে ওঠে সমাদ্দার। "তাই নাকি?"

"নিশ্চয়! যে সময়ে তুমি সেই বাগানবাড়ির গেটে প্রফুল্লর জন্যে অপেক্ষা করছিলে সেই সময়ে আমি শহরে ফিরে গলস্টোন কোম্পানির আপিস থেকে আসল কাগজখানা হস্তগত করি। স্টেশনে নেমেই গলস্টোন সাহেবকে ফোন করে আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যাতে সাহেবের বাড়ি থেকে প্রফুল্লকে একখানা নকল নমিনেশন পেপার দেওয়া হয়—এখন সব বুঝতে পারছ তো? যাতে তোমার নজর একেবারেই আমার দিকে না পড়ে সেইজন্যেই আমার এত কাণ্ড করা। প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং সব কিছু। অমন মূল্যবান কাগজ আমি নিতান্ত অবহেলাভরে আমার এই কোটের পকেটে করে নিয়ে এসেছি, ইচ্ছেমত জামা খুলেছি, রেখেছি, তুমি তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারনি। প্রফুল্লও তা জানে না। কোনদিন জানবেও না। যাক, বেচারা আনন্দেই আছে, ওর বেতন বেড়ে গেছে খবর পেলাম"—

CALL-কারখানা

কারখানা দু-রকমের। কাণ্ড-কারখানা আর কল-কারখানা। কল-কারখানাও আবার দু-রকমের হতে পারে, কিন্তু সেটা বঙ্কিমের পাল্লায় পড়ার আগে আমার ইয়াদ হয়নি।

ইস্কুলের সেক্রেটারি বিনা নোটিশে খতম হওয়ায় রেনিডের মত হঠাৎ এসে গেল ছুটিটা। বঙ্কিম বললে, "রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কী হবে, চ তোদের বাড়ি যাই। তোকে আমি একটা নতুন ধরনের খেলা দেখাব।"

নতুন ধরনের খেলাই বটে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখলে বোঝাই যায় না—খেলোয়াড়টিকে অন্তত। সত্যি, বঙ্কিম এত খেলাও জানে!

আমি বললাম, "তাই চল। বাবা আপিসে গেছেন, তাঁর বসবার ঘরটা ফাঁকা। মা ঘুমুচ্ছেন তেতলায়, কেউ কোথাও নেই। বেশ পীসফুল অ্যাটমসফিয়ার।"

আমাদের বাড়ির দোরগড়ায় এসে বঙ্কিম বললে, "তোদের বাড়ি টেলিফোন আছে তো রে?"

"না। টেলিফোন করতে হলে আমরা পিসেমশায়ের বাড়ি যাই। এখান থেকে আধ মাইল। অন্য জায়গায় করলে পয়সা লাগে কিনা!"

"সেখানকার অ্যাটমসফিয়ার কেমন? এইরকম পীসফুল?" বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করে।

"পিসে অবশ্য এখন আপিসে, কিন্তু—তা বলে মোটেই পীসফুল নয়।" আমি বলি; "বরং পিসিফুল বলতে পারিস। আমার পিসি রাতদিন সারা বাড়ি চষছেন। তাছাড়া বাড়িটা দুর্দান্ত রকমের

পিসতুতো-ভাই-ফুল। কাচ্চাবাচ্চা সব, কিন্তু কেউ তারা দুপুরে ঘুমোয় না—আর, যাকে বলে—আটমোস্ট ফিয়ার। এক-একটি ভয়ানক আবহাওয়া।"

"তাহলে সেখানে গিয়ে কাজ নেই। আমাদের বাড়িই চ, আমাদের টেলিফোন আছে। তোকে চকোলেট খাওয়াব।" বঙ্কিম বলল।

টেলিফোনের জন্যে না, চকোলেটের খাতিরেই বঙ্কিমের বাড়ি গেলাম।

গিয়েই বঙ্কিম টেলিফোন নিয়ে বসল—অবশ্যি, চকোলেটের বাক্স সামনে রেখে।

"খেলাটা হচ্ছে এই—" বঙ্কিম আমাকে বোঝাতে থাকে, "এই হচ্ছে টেলিফোন। (টেলিফোনটাকে ও পাকড়ায়) আর এর নাম, বুঝলি, রিসিভার—এমনি করে ধরতে হয়। (রিসিভারটা ও হাতায়) ধরে এইবার আমি একটু চক্ষু বুজোব। একটা নম্বর আন্দাজ করব। যা মনে আসে,—যে-কোন নম্বর। এই যেমন ধর—"

চোখ বুজে রিসিভারটাকে কানে ধরে বঙ্কিম উদাহরণ-স্বরূপ হয়ে ওঠে…"হ্যালো, বড়বাজার ৭০৭০? হ্যালো, আপনারা বড়বাজার সত্তর সত্তর? আপনি কে? দৌবারিক দাশ…মিষ্টান্ন বিক্রেতা?… ভালো কথা—আপনাদের দোকানে আজ কোন পচা সন্দেশ আছে? নেই? সব পাচার করে দিয়েছেন? পাড়াতেই করেছেন তো?…বেশ, বেশ!…ও, আমি? আমি আপনাদের পাড়ায় থাকি, পাড়ার ডাক্তার। ভাল করে কেন এখনো কলেরা লাগছে না এখানে, সেইজন্যে ভারি ভাবিত আছি। খুব করে পচা সন্দেশ চালান করুন মশাই, বুঝলেন? কদাপি টাটকা থাকতে বেচবেন না। আগে পচতে দিন—রীতিমত পচুক—তারপর পচিয়ে ছাড়ুন। বুঝেছেন…"

বঙ্কিম দৌবারিককে ত্যাগ করল।

"এই একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। তেমন খুব ভালো দৃষ্টান্ত নয় যদিও। দোকানদারদের আমি পছন্দ করি না—পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। ওদের নিয়ে বিশেষ সুবিধে হয় না। ডোমেস্টিক লোক পেলেই খেলাটা ভালো জমে। তবে, আজে-বাজে এইভাবে যাবার পর এক-একটা এমন মজার লোক কলে পড়ে তখন এসব সমস্ত লোকসান পুষিয়ে যায়···কেমন, খেলাটা তোর কেমন লাগছে?"

ওর কলের সময়ে আমি আমার কেরামতি দেখাচ্ছিলাম। চকোলেটদের মুখে পুরছিলাম। ধ্বংসাবশেষটিকে গিলে বললাম, "মন্দ না। হাতে কোনো কাজ না থাকলে এবং আধঘণ্টা এইভাবে কাটাবার পক্ষে ভালো তো। অবশ্যি, বাবারা যদি টের না পায়। বিশেষ, আমার মত বাবা। দে, এবার আমি করি···"

হাতে-কলমে যেমন শিক্ষা পেয়েছি—কাজে লাগাই। রিসিভার কানে দিয়ে চোখ বুজোতে হয়···আন্দাজ-মার্কা একটা নম্বরও বলে দিই···"হ্যালো, এটা ইস্কুল? দয়া করে একটু অঙ্কের মাস্টারকে ডেকে দেবেন···ক্লাসে গেছেন তিনি? লাইব্রেরিতে কে আছেন এখন? ইতিহাসের মাস্টার? আচ্ছা, তাঁকেই ধরতে বলুন।"

ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হোক, আপত্তি কী?

"হ্যালো, মাস্টারমশাই? আমার ছেলেকে আপনি যা পড়াচ্ছেন তা আর বলে কাজ নেই। এ রকম প্রাইভেট টিউশনি কদ্দিন থেকে করছেন মশাই। আমার ছেলেকে পড়াবার নামে যা ফাঁকি দিচ্ছিলেন—ছিঃ। সে কথা বলে আর কাজ নেই···"

"আজ্ঞে···আজ্ঞে···আপনি কী বলছেন!"

গলাটা বাবাসুলভ করে আমি বজ্রের মতো গর্জন করি: "আর আজ্ঞে আজ্ঞেতে কাজ নেই! এই আমার স্পষ্ট কথা, শুনে রাখুন! আপনাকে আজ থেকে আর আমাদের বাড়ি পড়াতে আসতে হবে না। পড়ানো তো ছাই, যা আমার ছেলের কাছে শুনছি, আপনি নাকি তার

ঘাড় ভেঙে আলুকাবলি খান, সিনেমা ছাখেন, তারপর তার জন্মদিনে পাওয়া ফাউন্টেন পেনটাও একদিনের মতো ধার নিয়ে জন্মের মতো সাবাড় করেছেন—মেরে দিয়েছেন একেবারে—এসব কী!"

অপর প্রান্ত থেকে এবার সন্দিগ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়: "দেখুন, আপনার রং নম্বর হয়নি তো? আমি তো আপনাকে বা আপনার ছেলেকে ঠিক ধরতে পারছি না!"

"আর পারবেনও না। আজকের সন্ধের গাড়িতেই আমরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছি। মধুপুব সটকে পড়ছি সটাং। আপনার মতো মাস্টারের খর্পর থেকে বাঁচতে হলে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। নমস্কার।"

টেলিফোন ছেড়ে বঙ্কিমের দিকে তাকালাম—"কী? কী রকম হল? প্রথম চেষ্টা হিসেবে নেহাত মন্দ হয়নি, কী বলিস?"

বঙ্কিম ঘাড় নাড়ল—একটু বাঁকা ভাবেই।

তারপর ওর পালা। ওর বরাতে একটা হল নো-রিপ্লাই, আরেকটা ফিরিঙ্গি মেম,—যার কথার মাথামুণ্ডু বোঝে কার সাধ্যি—যদিও আমাদের বঙ্কিমও ইংরিজি বোলচালে কিছু কম যায় না। কিন্তু হলে কী হবে, ওর বিলিতি সাধুভাষা মেমটার কানে ঢুকলেও মগজে ঢুকলো কি না কে জানে! বঙ্কিম বিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত তার টেলিফোনে জুটলো এক আর্দালি কিংবা চাপরাশি—সে স্পষ্টই ওর মুখের ওপব বলে বসলো—"কেয়া বুরবাক্‌কা মাফিক বাত করতা হ্যায়?"

এই ধরনের বাতচিতের পর বঙ্কিম ভারি দমে গেল। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে গুম হয়ে বসে থাকল।

তখন আমি পাকড়ালাম। প্রথমেই পাকড়ালাম এক নামকরা সাহিত্যিককে। উপন্যাস লিখতে তিনি ওস্তাদ। তাঁর উপন্যাসের কাঠামোর কোথায় কোন্ গলদ তাঁকে আমি অকাতরে জানালাম। আশ্চর্য, এর সমস্তই তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন। কী

ভাবে গল্প ফাঁদলে আরো ভাল নয়, তারও কিছু-কিছু হদিশ তাঁকে আমি দিলাম—পরবর্তী রচনায় সেগুলো তিনি কাজে লাগাবেন জানালেন আমায়।

বঙ্কিম তো গুম হয়ে ছিলই, এখন আরো গম্ভীর হয়ে গেল। ওর মুখ কালো হয়ে উঠতে দেখলাম—আমার হিংসেতেই, বলাই বাহুল্য।

কালো মুখে ও রিসিভারটাকে হাতে নিল এবার। নিয়ে চোখ বুজোল। আমি সেই ফাঁকে ওর আর-একটা চকোলেটকে মুখের তল্লাটে সরিয়ে ফেললাম—ও চোখ বুজে থাকতে থাকতেই।

বঙ্কিমের ভাগ্যে এবার পার্ক স্ট্রীটের থানা এসে পড়ল। থানা শুনে আর সে এগুতে সাহস করল না। "ওরে বাব্বা!" বলে সে রিসিভারটা রেখে দিল—তৎক্ষণাৎ। বললে, "থানা ধরা ঠিক নয়। উল্টে থানাতেই ধরে নিয়ে যায়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আর বাঘকে ছুঁলেও তাই।"

আমি ধরলাম। আমার টেলিফোন-জালে এবার একজন লেডি ডাক্তার ধরা পড়লেন। ভালই হল আরো। অনেক আলাপের পর তাঁর কাছ থেকে মা-র অম্বলের ব্যামোটার একটা পেটেন্ট দাওয়াই বাৎলে নিলুম—ফি-টি না দিয়েই—বিনে পয়সায়। আমার সাফল্যের উপরি সাফল্যে এবং নিজের ব্যর্থতার পর ব্যর্থতায় বঙ্কিম ক্রমেই চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠছিল। এবার সে চটে-মটে চকোলেটের বাক্সগুলো তুলে নিয়ে নিজের ড্রয়ারের মধ্যে বন্ধ করল।

বঙ্কিমটা ঐরকম। বড্ড হিংসুটে। অবশ্যি, আমি একটু বেশি-বেশি চাখছিলাম তা ঠিক, তবুও চকোলেটের এই বাজে খরচ তাও হয়ত ওর প্রাণে সইত, কিন্তু ওর খেলায় ওকেই হারিয়ে দেওয়া—এটা বুঝি কিছুতেই ওর বরদাস্ত হচ্ছিল না।

ক্রমেই ওর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে এল। ওর মুখে একটা ক্রুর হাসি খেলা করতে লাগল। ওর ঠোঁটের কোন বেঁকে গেল।

"এইবার শেষবার—আমার পালা হয়েই খতম।" এই বলে সে রিসিভারটাকে নিজের কানে লাগালো।

..."ও! আপনি? কদিন থেকে আপনাকে ফোন করব-করব ভাবছিলাম। ভাগ্যিস আপনাকে আজ পাওয়া গেল টেলিফোনে!"

বঙ্কিমের মুখে হাসি ধরে না। অনেক ধরাধরির পর কাউকে ধরতে পারলে কার না আনন্দ হয় বলো?

"আপনার ছেলের স্বভাব-চরিত্রের কথা না বলে পারছি না। সমস্ত আপনাকে খুলে বলাই আমার উচিত। এই বয়সেই ওর স্বভাবের ভেতর অ্যাতো গলদ ঢুকেছে যে—আপনাকে বলব-বলব মনে করছি কিছুদিন থেকেই, কিন্তু—" বঙ্কিম বলেই চলে। বলতে-বলতে মাঝে মাঝে বঙ্কিম কটাক্ষে আমার দিকে তাকায়। আমিও ওকে ইঙ্গিতে উৎসাহ দিই—"চালাও—চালিয়ে যাও! খাসা চালিয়েছ!"

বাস্তবিক, এমম ফলাও করে চমৎকার করে শুরু করেছে বঙ্কিমটা!

"...সিগারেট? হ্যাঁ, সিগারেট তো টানেই,—বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি ফুঁকে পার করে দিচ্ছে মশাই, সিগারেটের কথা কী বলছেন! সম্প্রতি আবার গাঁজা টানতেও শুরু করেছে।...আজ্ঞে হ্যাঁ... আমাদের খোট্টা দারোয়ানের সঙ্গে। প্রথমে লোটা লোটা ভাঙ ওড়াচ্ছিল, তখন আমি তেমন কিছু মনে করিনি, ভেবেছিলাম এ বন্ধুত্ব বেশিদিন স্থায়ী হবে না, ভাঙের বন্ধুত্ব অচিরেই একদিন ভাঙবে। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল। এখন তা গাঁজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আপনাকে খোলাখুলি সমস্ত জানতে বাধ্য হলুম।...

"ইস্কুল? কোথায় ইস্কুল! ইস্কুলে দু-একটা ক্লাস করেই সে আমাদের দারোয়ানের আস্তানায় চলে আসে। এসে প্রাণ ভরে গাঁজা টানে। এই তো, এখনো টানছে। সমানে টেনে চলেছে। আমার দোতলার পড়ার ঘরে বসে তার বিটকেল গন্ধ

পাচ্ছি—নিজের নাকেই পাচ্ছি। এমন মাথা ঘুরছে কী বলব! আপনি এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসুন না—হাতে-নাতে ধরতে পারবেন…"

"বাহাদুর! বাহাদুর!!" আমি মুক্তকণ্ঠে ওর প্রশংসা না করে পারি না।

"অ্যাঁ, কী বলছেন, কাজ ফেলে এখন আসতে পারা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়? আজ বাড়ি ফিরলেই ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবেন? তাড়িয়ে দেবেন বাড়ি থেকে? একেবারে—জন্মের মতই? তা, আপনার ছেলে, যা খুশি, যেমন অভিরুচি—আপনি যা ভাল বোঝেন করবেন, আমি বলেই খালাস…"

বঙ্কিম হাসিমুখে বিসিভার রেখে দিল।

"ফাস-কেলাস!" আমি বলে উঠি, "একটা ছেলের দফা একেবারে রফা—জন্মের মত সেরে দিয়েছিস! আজ ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে বেচারার জান যাবে…"

বঙ্কিম হাসিমুখে বললে, "হুম্।"

"বাপস্! অন্য কারো বাবা না হয়ে যদি আমার বাবা হত তাহলে যে কী দাঙ্গাতো ভাবতেই আমি শিউরে উঠছি! আমি তো আর আস্ত থাকতুম না! আমার একটি কথা বলবার আগেই বাবা আমার হাড় এক জায়গায় আর মাংস এক জায়গায় করে রাখতেন। সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা করে। মাংসের কিমা দেখেছিস? সেই কিমার মতোই অনেকটা…"

"তাহলে জেনে রাখো," বঙ্কিম বাধা দিয়ে জানায়, "তোমার বাবাই। তোমার বাবার আপিসেই এতক্ষণ আমি ফোন করছিলাম—আর কখনো আমার সাধের খেলা মাটি করতে আসবে?"

পদ্মাপাড়ি

ঘুম ভাঙতেই লাফিয়ে উঠেছি। ইস্, বড্ডো বেলা হয়ে গেল, ইস্টিমাব ধরতে পারলে হয় এখন! পদ্মা পার হওয়া সহজ ব্যাপার না! আমার পদ্মাযাত্রা প্রায় গঙ্গাযাত্রার মতোই প্রাণ নিয়ে টানাটানির কাণ্ড!

ভরসা এই, গোদাগাড়ি ইস্টিমারের গদাই-লস্করি চাল! সকালে ছাড়বার বায়না থাকলেও শুনেছি, সকাল-সকাল সে কোনদিনই ছাড়ে না। তাহলেও লাফিয়ে উঠলাম। দেরি করা ভাল নয়! কাল রাত্তিরের গাড়িতে লালগোলা ঘাটে এলেও, ট্রেন থেকে নেমে ইস্টিশানের সন্দেশের দোকানে এমনি মজেছিলাম যে, রসগোল্লার লালসা মিটিয়ে ইস্টিমারের ঘাটে গিয়ে দেখি, আমার ইস্টিমার তখন মাঝ-পদ্মায়। আমাব জন্যে মোটেই অপেক্ষা করেন নি।

বাড়ি ফিরছিলাম কলেজের ছুটিতে। পদ্মা পেরিয়ে আমাদের বাড়ি। লালগোলার ঘাটে ইস্টিমার চেপে ওধারে গোদাগাড়ি ঘাটে গিয়ে নামতে হয়। তারপরে আমন্নুরা ছাড়িয়ে, ফজলি আমের রাজ্য ভেদ কবে, আমসত্ত্বের দেশের উপর দিয়ে আরও কয়েকটা ইস্টিশান গেলেই সাম্‌সি। সাম্‌সি থেকে আবার মাইল-দশেকের ধাক্কা—পায়দল কিম্বা বাসচল্—তারপরেই আমাদের গ্রাম চনচল্। কিন্তু আমাকে এখনই চঞ্চল হয়ে উঠতে হল। কাল রাত্তিরে ইস্টিমার ফেল করেছি, সারারাত কেটেছে ইস্টিশানে—আজ যদি ফের নিজেকে এখানে এনে ফেলতে হয় তাহলেই হয়েছে!

ছুটলাম। সুটকেসটা গুছিয়ে নিয়েই ছুট দিলাম। কাল সারারাত কেটেছিল ওয়েটিং রুমে। ওয়েটিং রুম আর সন্দেশের দোকান ভাগাভাগি করে পথে নামতেই সদালাপী মিঠাইওয়ালা বাধা দিলে—"বাবু, কোথায় চলেছেন এমন হন্যে হয়ে? গরম গরম পুরি ভাজা হয়েছে খেয়ে যান।"

"তোমার পুরি আমার মাথায় থাক!" এই বলে আমি মাথা নাড়ি।

"যদি ইস্টিমার ধরতে চান তাহলে—"

"—ইস্টিমারেব এখনো দেরি আছে। এই তো? কালও তুমি ঐ কথাই বলেছিলে। ঐ বলে সারারাত তোমার মেঠাই আর মশার কামড় খাইয়েছ। কিন্তু আর না।"

ওব কথায় কান না দিয়ে আমি পা বাড়াই।

ঘাটের কিনারার কাছাকাছি পৌঁছে—আঃ, ঐ যে আমার ইস্টিমার—সামনেই খাড়া! ধড়ে আমার প্রাণ এলো এতক্ষণে। জেটিতে গিয়ে পড়লাম। জেটিতে ইস্টিমারে চারিধারেই ভাবি তাড়া। ভয়ানক হৈ-চৈ। এ খালাসি ডাকছে ও খালাসিকে, ইস্টিমারও ডাকছে—কাকে তা বলা কঠিন। কিন্তু তার দারুণ ভোঁ-ভোঁয় কানে তালা ধবিয়ে দেয়।

এত সব হাঁকডাকেব মধ্যে শ্রীমতীর আর তর সইছে না—এই কথাটাই স্পষ্ট। মুহূর্তের মধ্যেই উনি মায়া কাটাবেন, এই বার্তাই বুঝি জানাচ্ছেন। এহেন ব্যস্তবাগিশ ইস্টিমারের নাগালে যেতে হলে যে আমাকে দস্তুরমতো বেগ পেতে হবে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

বেগ পেতে হলও। এতক্ষণ তীরবেগে ছুটোছুটি করে পদ্মার তীরে পৌঁছে দেখি কিনা—ইস্টিমার জেটির বাঁধন কেটেছেন। ইস্টিমারে আর জেটিতে বেশ কয়েক হাতের ফারাক তখন। ইস্টিমারের পাটাতন—ইস্টিমার ভিড়লে যেটা জেটির

গায়ে এসে লাগে—যার উপর দিয়ে যাত্রীরা ওঠে নামে—যায় আসে—গট্ গট্ করে হাঁটে—কুলিরা বিলকুল মাল তোলে নামায় —যার সঙ্গে ইস্টিমারের জেটতুতো সম্পর্ক—সেই সম্পর্ক আর নেই।

ইস্টিমারের খালাসিরা পাটাতন তুলে নিতে যাচ্ছে।

এখন বুকের পাটা চাই! আমি আগু-পিছু করি। লাফ দেব —কি দেব না? তারপর মারি লাফ! পড়ি গিয়ে পাটাতনের উপর—পদ্মার ভগ্নাংশ পার হয়ে! বসে পড়ি গিয়ে। সবাই হৈ-হৈ করে ওঠে।

ইস্টিমারের জেটির সব লোক। কিন্তু কে কী বলছে তখন কি আর আমার হুঁস আছে, না কিছু দেখছি, না শুনছি! পায়ের তলায় পাটাতন পেয়েছি এই ঢের! এক মুহূর্ত বসে থাকি আমি, তারপর টলতে টলতে উঠি, উঠে দাঁড়াই। সুটকেসটা আমার হাতে তখনও। তারপর আমার নজর পড়ে নিচের দিকে। পাটাতনের তলদেশে থৈ-থৈ জল। আবার আমি বসে পড়ি। পাটাতনের নিচেই পদ্মার বিস্তার। আমার মাথা ঘুরতে থাকে। উবুড় হয়ে পড়ি আমি—পাটাতনের উপর। হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটি··· আস্তে আস্তে এগুতে থাকি···সুটকেস টানতে টানতে। হামাগুড়ি দিচ্ছি তো দিচ্ছিই। ইস্টিমারের ডেক মনে হয় যেন মাইল-দেড়েক দূরে। যাই হোক, যত দূরেই হোক, যত দেরিই হোক গুঁড়ি মেরে মেরে পৌঁছুলুম গিয়ে ডেকএ। দেহের সঙ্গে সঙ্গে সারা মনও যেন আমার ডেকে উঠল—পেয়েছি! পেয়ে গেছি!

ডুকরে উঠল আমার মনের থেকে ধন্যবাদ—বিধাতার উদ্দেশে—ইস্টিমারের উদ্দেশে—আমার উদ্দেশে—উন্মুখর হয়ে। ডেকের উপর নিজেকে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে থাকি। নাঃ, আর না—আর কখনো এমন নয়! কদাপি আর এরূপ বিপজ্জনক

কাজে হাত পা দেবো না শপথ করি আপন মনে। ভগবানের দয়ায় এ যাত্রা বেঁচে গেছি খুব।

হুঁস হতে দেখলাম, একজোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে।

নীল রঙের পোশাক পরা এক খালাসি।

"ইস! ইস্টিমার ধরা কি সোজা?" হাঁক ছেড়ে আমি বলি, "কিন্তু ধরতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত! কী বলো খালাসি সাহেব?"

খালাসিটি হাসল, "কী দরকার ছিল বাবু এত মেহনতের? জাহাজ তো আমরা ভিড়োচ্ছিলাম জেটিতে। একটু বাদে এমান হেঁটেই আসতেন। সবুর করলেই পারতেন একটু।"

অ্যাঁ? তখন আমার খেয়াল হল। হ্যাঁ, তাও তো হতে পারে! পাটাতন নামিয়ে জেটির গায়ে লাগানো হচ্ছিল—আমি বুঝতে পারলাম তখন।

তাকিয়ে দেখলাম, তাই। গোদাগাড়ির ইস্টিমার আর লাল-গোলার ঘাটে আত্মীয়তা সুনিবিড়। জেটতুতো সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ততক্ষণে।

গোদাগাড়ির যাত্রীদের নিয়ে ইস্টিমারটা পৌঁছল সেই-মাত্তর।

পঞ্চাননের অশ্বমেধ

ভাল আপদ হয়েছে ঘোড়াটাকে নিয়ে! পঞ্চানন কী যে করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। কলিযুগ হয়ে অবধি আজকাল অশ্বমেধের বেওয়াজ নেই, তা নাহলে সে হয়ত একটা অশ্বমেধ যজ্ঞই করে বসত। কথা নেই বার্তা নেই, একটা কৃষ্ণের জীবকে তো অধর্ম করে মেরে ফেলা যায় না! তাই পঞ্চানন ভেবে রেখেছে, সুবিধে পেলেই একবার ভট্টপল্লীর দিকে যাবে—মা-কালীর কাছে অশ্ববলি দেয়া যায় কি না তার ব্যবস্থাটা জিজ্ঞাসা করবে।

সে মনে মনে আলোচনা করেছে, কেনই বা না দেওয়া যাবে? পাঁঠা যখন দেওয়া যায়—অশ্ব তো পশুব মধ্যেই গণ্য? পাঁঠাও একটা পশু ছাড়া আর কী? পাঁঠাবও চারটে পা, ঘোড়ারও,—সব-দিকেই প্রায় মিল আছে, যা কিছু তফাত তা কেবল ল্যাজেব আর আওয়াজের। তা, শাস্ত্রেই যখন রয়েছে—মধ্বভাবে গুড়ং দত্যাৎ, তখন পাঁঠাভাবে ঘোড়াং দত্যাতের বিধান কি আর শাস্ত্রে নেই? নিশ্চয়ই আছে।

এককালে অবশ্যি ঘোড়াটা খুবই কাজ দিয়েছিল। কিন্তু বুড়ো হয়ে অবধি আজকাল কোন কাজে লাগা দূরে থাক, তাব পেছনে লেগে থাকাই একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে ভারি পেটুক হয়েছে ঘোডাটা। জামার হাতা, খববের কাগজ, ছেলেদের পুঁথিপত্র, দরকাবি চিঠি, কখন কী খায় স্থির নেই। তা ছাড়া, রান্নাঘরের দিকেও বেশ নজর আছে।

এদিকে পঞ্চাননের সঙ্গে তার দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা।

রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক আওয়াজ কিম্বা বেগুনভাজার গন্ধ এলে কার সাধ্য তাকে থামায়! পাড়াগেঁয়ে মেটে বাড়ি পঞ্চাননের—ধানের গোলাগুলো ঘুরে উঠোন পেরিয়ে গেলেই রান্নাঘর—মুহূর্তের মধ্যে অশ্ববরকে সেখানে উপস্থিত দেখা যাবে। পঞ্চাননের গিন্নির কি পরিত্রাণ আছে ওকে বেগুনভাজা না দিয়ে? বেগুনভাজার প্রতি পঞ্চাননের দারুণ লোভ, অথচ এই ঘোড়াটার জন্যেই সে পেট ভরে বেগুনভাজা খেতে পায় না।

সেদিন পঞ্চানন-গিন্নি বেগুন না ভেজে, বোধহয় ঘোড়াটাকে ঠকাবার মতলবেই, বেসন দিয়ে বেগুনি ভাজাছলেন। গন্ধ পাবামাত্রই ঘোড়াটা সেইখানে হাজির! দু-একবার সে গিন্নির মনোযোগ আকর্ষণ কবেছে—চিঁহি, চিঁহি—সংস্কৃত ভাষায় যার মানে হচ্ছে—দেহি, দেহি!

কিন্তু গিন্নি কর্ণপাত না করায় সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নিকে ঠেলে ফেলে সেই ঝুড়িভরা সমস্ত বেগুনি আত্মসাৎ করে পরম তৃপ্তিব সঙ্গে খেতে শুরু কবে দিয়েছে। সেদিন থেকে ঘোডাটার প্রতি আর পঞ্চাননেব চিত্ত নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে, ভাটপাড়া সে যাবেই।

গিন্নিকে সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, "ফের যদি তুমি ঘোড়াটাকে আস্কারা দাও তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন! সত্যি বলছি! একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে!" ঘোড়াটা কিন্তু গ্রাহ্যও করে না পঞ্চাননকে।

তার পরের দিনই সে কলকাতা থেকে সদ্য-আনানো পঞ্চাননের টর্চবাতিটা মুখের মধ্যে পুরেছিল। কিন্তু ভালো কবে চিবিয়ে যখন বুঝল যে ওটা ঠিক বেগুনি নয় তখন বিরক্ত হয়ে ফেলে দিল।

টর্চলাইটটার অবস্থা দেখে পঞ্চানন তো অগ্নিশর্মা! সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার কান ধরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল—"হতভাগা! তোর কি একটুও বুদ্ধি নেই? তুই যে একটা গাধারও অধম হলি!"

ঘোড়া মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে—"চিঁ-হিঁ-হিঁ।" অর্থাৎ, যা বলো তুমি।

পঞ্চানন যখন মাথা ঘামাচ্ছে—এই হঠকারিতার জন্যে কী শাস্তি ওকে দেওয়া যায়, তখন ওর ছোট ছেলে বটকৃষ্ণ এসে পরামর্শ দিল, "বাবা, ওর ল্যাজ কেটে দাও, তাহলে আর মশা তাড়াতে পারবে না।"

পঞ্চানন ভেবে দেখল, এ কথা বেশ। ওর শাস্তির ভারটা মশার উপরে ছেড়ে দেওয়াটা মন্দ নয়।

কিন্তু কাঁচি নিয়ে উদ্যোগ-আয়োজনের মুখে ন-মেয়ে রাধারানী বললে,—"বাবা, করছ কী! মশার কামড়ে তাহলে ও আমাদের মশারির মধ্যে এসে ঢুকবে যে!"

বাধ্য হয়ে পঞ্চানন কাঁচি থামিয়েছে,—একটা ভাববার কথা বৈকি! ঘোড়াটার যেরকম বুদ্ধি-সুদ্ধির অভাব, তাতে সবই ওর পক্ষে সম্ভব। মশারির মধ্যে ঢোকা কিছু কঠিন না ওর পক্ষে!

এমনই সমস্যার মুখে জ্যোতিষ বোস এসে উপস্থিত—"কী হে পঞ্চানন, কী হচ্ছে?"

"এসো ভাই। ট্রেন করছি ঘোড়াটাকে।"

"তুমি হর্স-ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে?"

পঞ্চানন মাথা নেড়ে বললে—"আর ভাই, শিক্ষা না দিলে নিজের ছেলেই গাধা হয়ে যায়, তা ঘোড়া তো পরের ছেলে।"

"তা বেশ। কিন্তু তোমার দেনার কথাটা একেবারে ভুলে গেছ। আমাদের পাড়াই মাড়াও না দু-বছর থেকে, ব্যাপার কী!"

পঞ্চানন আকাশ থেকে পড়ল,—"কিসের দেনা!"

"সেই যে একদিন বাজারে নিলে, বছর-দুই আগে!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—চার আনা পয়সা। পদ্মার ইলিশ এসেছিল হাটে, পয়সা কম পড়ল, তোমার কাছে নিলুম বটে। মনে ছিল না ভাই!"

জ্যোতিষ বোস ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবি, এ কথা পঞ্চানন জানত। কিন্তু বুড়ো বয়সে সে যে এত বেশি হিসেবি হয়ে উঠবে যে চার আনা পয়সার কথা দু-বছর ধরে মনে করে রেখে ভিন্‌গাঁ থেকে তিন মাইল হেঁটে চাইতে আসবে, পঞ্চানন তা ধারণা করতে পারেনি। বাপ পাঁচশো টাকা রেখে গেছল, সুদে খাটিয়ে তেজারতি কারবারে সেই টাকা পঞ্চাশ হাজারে সে দাঁড় করিয়েছে—কিন্তু সামান্য চার আনার মায়া সে ছাড়তে পারেনি ভেবে পঞ্চানন আশ্চর্য হল।

"তা ভাই পঞ্চানন, প্রায় আড়াই বছর হল তোমার ধার নেওয়া। আমার খাতায় সমস্ত হিসেব লেখা আছে, নিজে গিয়ে দেখতে পারো একদিন। এইবার একটু গা করে দিয়ে দাও।"

"কী যে বলো তুমি! সামান্য চার আনা পয়সার জন্যে আমি অস্বীকার করব? তা, তুমি কষ্ট করে এতদূর এসে আমাকে লজ্জা দিলে। রাধু, তোর মার কাছ থেকে চার আনা নিয়ে আয় তো! আর বল্ গে তোর জ্যোতিষ কাকার জন্যে বেগুনি ভাজতে। বেগুনি দিয়ে তেল-মুড়ি খেতে বেশ হে! তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা।"

জ্যোতিষ বোস বাধা দিয়ে বললে, "তা হবেখন। খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না! কিন্তু একটা ভুল করছ তুমি, আড়াই বছর পরে পয়সাটা তো আর চার আনা নেই—"

কিছু বুঝতে না পেরে পঞ্চানন বললে, "চার আনা নেই কী রকম?"

"আহা, বুঝতে পারছ না? সুদে আসলে তা পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌনে তিন পাই দেওয়া একটু শক্ত হবে তোমার পক্ষে, তা, তুমি পাঁচ টাকা এগারো আনাই দাও আমায়।"

"অ্যাঁ!" পঞ্চাননের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না।

পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাই। পৌনে তিন পাই দেওয়া তার পক্ষে শক্ত নিশ্চয়ই—কিন্তু পাঁচ টাকা এগারো আনাটা দেওয়াই যে তার পক্ষে এমন কী সহজ তা সে ভেবে পেল না।

পঞ্চানন ভেবে কিনারা পায় না। হ্যাঁ, জ্যোতিষটা ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবি—একথা তার অজানা নয়, কিন্তু তার হিসেবিতা যে বয়সের সঙ্গে এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে তা কে জানত? নাঃ, জব্দ করতে হবে ওকে!

কাষ্ঠহাসি হেসে পঞ্চানন জবাব দেয়—"তা, নেবেই নাহয় পাঁচ টাকা এগারো আনা। তোমাকে দিলে তো জলে পড়বে না! বোসো, জিরোও, গল্প করো,—অনেকদিন পরে দেখা।"

"হ্যাঁ বসব বৈকি! বেগুনিও খাব। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে মন্দ না—কিন্তু কচি শশা আছে তো?"

পঞ্চানন মনে মনে মতলব এঁটে বললে, "এতটা রোদে তিন ক্রোশ দূর থেকে হেঁটে এসেছ, এই বয়সে এতটা পরিশ্রম করা কি ভাল তোমার পক্ষে? একটা ঘোড়া রাখো না কেন? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হাঁটার পরিশ্রম হয় না, তাছাড়া রাইডিং একটা ভাল ব্যায়ামও। দেখছ না, আমিও একটা ঘোড়া রেখেছি।"

জ্যোতিষ পঞ্চাননের ঘোড়ার দিকে দৃকপাত করে জবাব দেয়, "বেশ ঘোড়াটি তোমার। দেখে লোভ হয়। আমিও অনেক দিন থেকে ভাবছি কথাটা। সত্যিই এ বয়সে আর হাঁটা-চলা পোষায় না। কিন্তু মনের মতো ঘোড়া পাই কোথায়?"

"কী রকম মনের মতো শুনি?"

"এই ধরো খুব তেজী হবে না, আস্তে আস্তে হাঁটবে। এই বুড়ো বয়সে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই, তাহলে কি হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে।"

"তা, সে রকম ঘোড়া কি আর পাওয়া যায়? কিনে, শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হয়। এই আমার ঘোড়াটা কি কম তেজী ছিল! অনেক কষ্টে ওকে শিক্ষিত করেছি। এখন যদি ওর পিঠে তুমি চড়ো তাহলে ও হাঁটছে বলে তোমার মনেই হবে না। এমন শান্ত, এমন বিনয়ী, এমন নম্র স্বভাব—মানে, সুশিক্ষার যা কিছু গুণ, সব আছে ঘোড়াটার।"

"তা ভাই, তোমার ঘোড়াটির মতো শিক্ষিত ঘোড়া পাই কোথায়? আমি তো আর তোমার মতো ব্রেকার নই! তা, তোমার ঘোড়াটা কত দিয়ে কিনেছিলে?"

"দাঁওয়ে পেয়েছিলাম ভাই, মোটে পনেরো টাকায়।"

"তা তুমি এক কাজ কর না পঞ্চানন! পনেরো টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে ঘোড়াটা আমাকে দাও না কেন? তোমার তো এগারো আনা পৌনে তিন পাই লাভ থাকল, তাছাড়া এতদিন চড়েও নিয়েছ। এই নাও দশ টাকার নোট—"

"না ভাই, ঘোড়াটা শিক্ষিত যে!"

"আবার নতুন ঘোড়া শস্তায় কিনে ট্রেন করে নিতে পারবে—তোমার যখন ট্রেন করার ক্যাপাসিটি আছে। ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে বেশি লাভ না-ই করলে। এই নোটখানা নাও, তোমার বাকি ধারও শোধ হয়ে গেল—তা নইলে ভেবে দেখ, পৌনে তিন পাই জোগাড় করা তোমার পক্ষে শক্ত হতনা কি?"

পঞ্চানন হাসি চেপে রেখে আমতা আমতা করে বলে, "তা, তুমি যখন এত করে বলছ, ছেলেবেলার বন্ধুর একটা কথা রাখলাম নাহয়। বেশ, নাও তুমি ঘোড়াটা।"

—"ভালোই হল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়েছে থানায়, যাচ্ছিলুম তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। মনে করলুম পথে তো তোমার বাড়ি পড়বে, দেখা করে টাকাটা নিয়ে যাই। ভালোই করেছি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে হেঁটে গেলে কি ভালো দেখাত?"

জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা হল। সত্যি, এমন শিক্ষিত ও শান্ত ঘোড়া প্রায় দেখা যায় না। পঞ্চানন যা বলেছিল—হাঁটছে বলে মনেই হয় না। অনেক তাড়াহুড়ো দিলে এক পা হাঁটে।

এদিকে পঞ্চাননও খুশি। নিশ্বাস ফেলে বলে—বাঁচা গেল এতদিনে! আপদ বিদায়, সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা লাভ! অশ্বমেধ করতে যাচ্ছিলুম, তা, জ্যোতিষ বোসকে দেওয়াও যা, অশ্বমেধ করাও তা। পৌনে তিন পাই দেওয়া বেজায় শক্ত হত!

কেবল গিন্নি একটু দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশ করেছেন—"খেতে পেত না বেচারা, তাই ওরকম করে ছোঁক-ছোঁক করত! ঘোড়ায় দানা খায়, ছোলা খায়, কত কী খায়—সে-সব ও কখনো চোখেও দেখেনি। টর্চ খাবে, বেগুনি খেতে চাইবে! তা, ওর দোষ কী! কথায় বলে পেটের জ্বালা—"

পঞ্চানন বলল—"তাহলে ঘোড়াটার ভাগ্য বলতে হবে! জ্যোতিষরা বড় লোক—সুখে থাকবে ওদের বাড়ি। আমরা গরিব মানুষ, নিজেদেরই দানা পাই না, কোথায় পাব ঘোড়ার দানা!"

হেঁটে গেলে এতক্ষণে থানায় পৌঁছোনো যেত, তার তিন গুণ সময় লাগল জ্যোতিষ বোসের ঘোড়ায় চেপে যেতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভারি খুশি। এতখানি রাস্তা সে অশ্বারোহণে এসেছে, কিন্তু একবারও পড়ে যায়নি, কেবল ওঠার আর নামার সময় যা একটু কষ্ট হয়েছে। ওঠার সময় সে টুলে দাঁড়িয়ে চেপেছিল। কিন্তু নামবার সময় সে অনেক চেষ্টা করল যাতে ঘোড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে আর তার পক্ষে নামাটা সহজ হয়; কিন্তু ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটু কাত হল না পর্যন্ত। তার আশা ছিল শিক্ষিত ঘোড়া তার অনুরোধ রক্ষা করবে, কিন্তু ঘোড়াটা না বুঝল তার ইঙ্গিত, না কান দিল তার সাধ্যসাধনায়। বাধ্য হয়ে তাকে অনেকটা প্রাণের মায়া ছেড়েই লাফিয়ে নামতে

হল, কিন্তু সুখের বিষয় তার হাড়-গোড় ভাঙে নি কিম্বা সে একটুও জখম হয় নি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষ বোসের আগে থেকেই আলাপ ছিল। জ্যোতিষ সেলাম ঠুকতেই তিনি "হ্যালো মিঃ বোস" বলে তাকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে দানা দেবার হুকুম হল আর্দালির উপর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও জ্যোতিষ বোস আলাপ করছেন, এমন সময় আস্তাবল থেকে এক বিরাট আওয়াজ এল—চ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ।

কী ব্যাপার? ম্যাজিস্ট্রেট এবং জ্যোতিষ দুইজনেই চমকে উঠলেন। ঘোড়ার আওয়াজ বটে, কিন্তু এ রকম আওয়াজ তাঁরা জীবনে কখনও শোনেন নি। এমনকি, যে ঘোড়া ডার্বি জিতেছে, সেও এ রকম উচ্চধ্বনি করে না। দুজনেই আস্তাবলের দিকে ছুটলেন। সেখানে তখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আর ঘোড়াটা কেবল করছে—চ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ।

ঘোড়ার সামনে দু-বালতি ভরে ছোলা আর দানা সাজানো রয়েছে, কিন্তু ঘোড়াটা সেসব স্পর্শও করে নি। সে বোধহয় তার এতখানি সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছে না। সে একবার করে বালতির দিকে তাকাচ্ছে, আর তার ভেতর থেকে অট্টহাস্য ঠেলে উঠছে—চ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ।

কী করে ওর অট্টহাস্য থামানো যাবে—সবাই দারুণ ভাবনায় পড়ল। ঘোড়ার হাসি থামানো কি সহজ ব্যাপার? কিন্তু বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হল না কাউকে।

হাসতে হাসতে ঘোড়াটা মারা গেল।

বাজিরাও—অদ্বিতীয়

"আয়, একটা বাজি ধরা যাক"—চিনেবাদামের খোসা ভাঙতে ভাঙতে বললেন হর্ষবর্ধন।

"বাজি রাখা ভাল নয়।" গোবর্ধন বলল। খোলা-ভাঙা যে বাদামটা দাদার আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেছল, সেইটে তুলে নিজের মুখে পুরে দিয়ে অম্লান বদনে বলল সে।

"ভালো নয়, হ্যাঃ! ক-রকম বাজি হয় জানিস তুই?"

"দু-রকমের। বাজি ধরা, আর বাজি হারা।" বলতে বলতে পতনোন্মুখ আরেকটা বাদাম হাতড়াবার তার অপচেষ্টা।

"দু-রকমের বটে, তবে ও নয়।" বাদামটা সামলে দাদা বলেন, "শোন্। এক হল, গজবাজি, আরেক হল গিয়ে—"

"গজবাজি কী দাদা?" গোবরা বাধা দিল।

"কী আবার! হাতি-ঘোড়া…আবার কী? আর দুই হল গিয়ে—ডিগবাজি।"

"একই কথা। আমি যা বলছিলাম তাই। বাজি ধরা, আর বাজি হারা। জিততে পারলেই হাতি-ঘোড়া—আর হেরে গেলেই ঐ—ডিগবাজি।"

গোলদিঘির এক কোনে বসে হর্ষবর্ধন একমনে বাদাম ভাঙছিলেন, আর তাঁরই পাশে মাঠের ঘাসে গা এলিয়ে গোবরা বাদাম ভাঙা দেখছিল—কখন বেহাত হয়ে এক-আধটা ফসকায়। দাদার চেয়ে বাদামের দিকেই তার নজর বেশি।

"আয়, একটা বাজি ধরা যাক।" হর্ষবর্ধন আবার বললেন।

"গজবাজি?" গোবরা প্রশ্ন করল, "সে এখানে কোথায়?

ধরতে গেলে তো চিড়িয়াখানায় যেতে হয় এখন। সে তুমিই ধরো গে দাদা। আমার গায়ে জোর নেই অতো। আর উৎসাহও নেই। তবে যদি ডিগবাজির কথা বলো তো আমি রাজি। সে ধরবার জিনিস নয়—খাবার জিসিস। চিনেবাদামের মতোই খাওয়া যায়। খাবো ডিগবাজি?"

আমাদের সরিয়ে দিয়ে হর্ষবর্ধন বললেন, "আরে না না, সে-বাজি নয়। তোকে খেতে হবে না—চিনেবাদাম, ডিগবাজি, কিছু না। অনেক খেয়েছিস, খাসনে আর—পেট কামড়াবে। আমি বলছি অন্য বাজির কথা। মনে কর্, আমি তোকে একটা কথা জিগেস করলাম—তুই তার জবাব দিলি—না যদি পারিস হেরি গেলি তুই। তারপর তুই আমায় একটা কথা জিগেস করলি—না পারলে আমি বাজি হারলাম।"

"ওঃ, হেঁয়ালি? তুমি হেঁয়ালির কথা বলছ?"

"তা হেঁয়ালিও বলা যায়। কিন্তু দশ টাকা করে বাজি থাকবে। যে জবাব দিতে পারবে না, তাকে টাকা দিতে হবে।"

"বেশ, কিন্তু আমি হারলে তোমায় অর্ধেক দেব। আমার তো তোমার মতো অতো বিদ্যে নেই।"

"বা রে! আমার বিদ্যে বেশি কিসের? সেই একই ফিফ্‌থ্ ক্লাস অবধি পড়া দুজনের—"

"তাহলেও, আমি কি তোমার সমান? পড়াশোনায় হয়ত এক হলেও তুমি আমার চেয়ে কতো বড়ো। আর কত মোটা—সেটাও তো দেখতে হয়। বিদ্যে ছাড়া বুদ্ধি বলে একটা জিনিস নেই? তোমার বুদ্ধিও আমার চেয়ে বেশি হৃষ্টপুষ্ট নিশ্চয়ই। তাছাড়া, তুমি আমার কতো আগে জন্মেছ, কত বেশি দেখেছ শুনেছ। পড়াশোনাই কি সব? দেখা-শোনাটা কিছু না?"

"তা বটে।" ভাইয়ের প্রশস্তি শুনে হর্ষবর্ধনের মুখপট—মুখ থেকে পেট অবধি—প্রশস্ত হাসিতে ভরে যায়। "বেশ, তুই তাই

দিস। তুইই তাহলে শুরু কর্। তোর ধাঁধাটাই শোনা যাক আগে।"

গোবর্ধন একটু ভেবেচিন্তে মাথা নাড়ল—"আচ্ছা সেই জন্তুটা কী বলো তো দাদা, যে তিন পায়ে দৌড়োয় আর দু-পায়ে ওড়ে?"

হর্ষবর্ধন দাড়ি চুলকোলেন, নাক সিঁটকোলেন, আকাশকে ভেংচি কাটলেন। তাঁর ভুরু কোঁচকালো, ভুঁড়ি কেঁপে উঠল—কিন্তু জন্তুটার কোনো কিনারা পেলেন না। অবশেষে মুখ বিকৃত করে তিনি জানালেন,—"নাঃ পারা গেল না! এ যে কোন্ জানোয়ার, আমার জানা নেই। তোর পাড়াটে বন্ধুদের কেউ যদি হয় তো বলতে পারিনে। এখনো পাড়াপড়শির সবার সঙ্গে তো আমার পরিচয় হয়নি! এই নে, তোর দশ টাকা। ধর্।" এই বলে পকেট থেকে কবকরে দশটা টাকা বের করে ঠনঠ্ঠন গোবরাকে গুনে দিলেন।—"এখন উত্তরটা কী, বলো তো বাপু?"

"আমিও জানিনা।" গোবরা জবাব দিলো: "এই নাও পাঁচ টাকা।" গোবরাও বাজিয়ে দিল। বাজির টাকা তো!

হেরে গিয়ে হর্ষবর্ধন গুম হয়ে থাকলেন খানিক। কিন্তু ঐ খানিকক্ষণ। তার পরেই আবার উদ্দীপনা দেখা দিল তাঁর—"চল আমরা সরবত খেয়ে আসি। চিনেবাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে শুকিয়ে গেছে গলাটা—একটু ভিজিয়ে নিয়ে আসা যাক, চ।"

গোলদিঘির পুবধারে নামজাদা দুই সরবতি দোকান—প্যারাগন আর প্যারাডাইজ—পাশাপাশি। রঙ-বেরঙের ঘোলের সরবত সেখানে। একটু আগেই হর্ষবর্ধন একরকমের ঘোল খেয়েছেন ভায়ের কাছে—বিষে বিষক্ষয়ের মতো ঘোলে ঘোলক্ষয় করার ইচ্ছেটাও হয়ত তাঁর হচ্ছিল। টাকা পাঁচটা না ফিরে পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলেন না তিনি।

প্যারাডাইজের চেয়ারে বসেই বললেন, "দু-মিনিটের মধ্যে

পর-পর পাঁচ গেলাস সরবত খেতে পারিস তুই?" এবার ভাইকে ভালো করে ঘোল খাওয়ানোর তাঁর মতলব।

"যদি পারি? কী বাজি?"

"পাঁচ টাকা পাবি। না পারলে ঐ পাঁচ টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। আড়াই টাকা দিলে তখন শুনব না।"

গোবরা একটু চুপ করে থেকে বেরিয়ে গেলো। ফিরে এল মিনিট দুই বাদে।

"গেছলি কোথায়? জলবিয়োগ করতে বুঝি?" জিজ্ঞাসা হল দাদার।

"জলবিয়োগ—তার মানে?"

"মানে, জলযোগের আগে পেট খালি করতে গেছলি নাকি? কথ্য ভাষায় না বলে সাধু ভাষায় বললাম কথাটা।"

"কিন্তু আমার প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করা কি তোমার উচিত? আমি না তোমার ভাই? আপন সহোদর ভ্রাতা না? তুমি দাদা হয়ে—?" গোবরা গোঁ গোঁ করে।

"কোথায় গেছলি—তাই জানতে চেয়েছিলাম।"

"সে খোঁজে তোমার দরকার? সরবত দিতে বলো। আর টাকা বার করো তোমার।"

বলতে-না-বলতে পাঁচ গেলাস সরবত গোবরার সামনে এসে হাজির। পাঁচ রকমের সরবত—রোজ, ম্যাঙ্গো, পাইন-অ্যাপেল, রাস্প্‌বেরি, ব্যানানা—ঘোল দিয়ে বানানো পঞ্চরঙের দৃশ্য। বড় বড় ঢাউস গেলাস পাঁচটা—যেমন রঙিন তেমনি সঙিন।

গোবরা চোখ বুজে শুরু করল—দেয়াল-ঘড়িটার দিকে বারেক তাকিয়েই। হর্ষবর্ধনও নিজের হাতঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার প্রতি কড়া নজর রাখলেন।

দেখতে-না-দেখতে গোবরা পাঁচ গেলাস সাবাড়ে দিল—তখনো দশ সেকেণ্ড তার হাতে। দু-মিনিট পুরতে তখনো দেরি।

"অবাক কাণ্ড!" হর্ষবর্ধন থ হয়ে গেছেন—"তুই পাঁচ-পাঁচ গেলাস সরবত ফাঁক করলি—অ্যাঁ—!" কথ্য, অক কোনে ভাষাই জোগায় না। বিস্ময়ে ভাসেন।

"পারব আমিই কি জানতাম? পরীক্ষা করে, ফলেন পরিচীয়তে করে এলাম যে! দেখে এলাম একটু আগে।"

"তার মানে? কী দেখে এলি? কিসের পরীক্ষা?"

"খেতে পারব কি না তার পরীক্ষা। তোমার কী, তুমি তো বাজি হেরে গিয়ে টাকা বাজিয়ে দেবে। কিন্তু আমি বাজি জিততে পারব কি না সেটা তো আমার নিজেকে বাজিয়ে দেখতে হয়!"

হর্ষবর্ধনের তবু বোধগম্য হয় না। হাঁ করে থাকেন তখনো।

"দু-মিনিটে পাঁচ-পাঁচ গেলাস সরবত ওড়ানো—চালবাজি না, চাট্টিখানি নয়! পারব কি না কে জানে? খেয়ে দেখিনি তো কখনো! তাই একটু আগে পাশের প্যারাগনে গিয়ে পাঁচ গেলাস খেয়ে যাচিয়ে তবে এসেছি।"

জোড়াভরতের জীবন-কাহিনী

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। গত শতাব্দীর শেষের দিকে, তখনো তোমরা আসো নি পৃথিবীতে। আমিও আসব কি না তখনো আন্দাজ করে উঠতে পারছিলাম না! সেই সময়ে বারাসতে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য তার পর আমিও এসেছি, তোমরাও এসেছ। আসার কিছুদিন পরেই দিদিমার কাছে গল্পটা শুনি। তোমাদের দিদিমা নিশ্চয়ই বারাসতের নন, কাজেই তোমাদের শোনাবার ভার আমাকেই নিতে হল।

সেই সময়ে একদা সুপ্রভাতে বারাসতে রামলক্ষ্মণ ওঝার বাড়ি জমজ ছেলে জন্মালো। জমজ, কিন্তু আলাদা নয়,—পেটের কাছটায় মাংসের যোজক দিয়ে আশ্চর্য রকমে জোড়া। এই অদ্ভুত লক্ষণ রামলক্ষ্মণ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার বরাত জোর বলতে হবে। লোকে একেবারে একটা ছেলেই পায় না, আমি পেলাম দু-দুটো—একসঙ্গে এবং একাধারে।"

ডাক্তার এসে বলেছিল, "কেটে আলাদা করবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তাতে বাঁচবে কি না বলা যায় না।"

রামলক্ষ্মণ বললেন—"উঁ হুঁ হুঁ! যেমন আছে তাই ভালো। ভগবান দিয়েছেন, কপালের জোরে ওরা বেঁচে থাকবে।"

ছেলেদের নাম দিলেন তিনি রামভরত ও শ্যামভরত।

পৌরাণিক যুগে জড়ভরত ছিল, তার বহুকাল পরে কলিযুগে এই বিস্ময়কর আবির্ভাব—জোড়াভরত।

জোড়াভরত প্রতিদিনই জোরালো হয়ে উঠতে লাগল।

ক্রমশ হামাগুড়ি দিতেও শুরু করল। চার হাতে চার পায়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! কে একজন যেন মুখ বেঁকিয়েছিল—"ছেলে না তো, চতুষ্পদ!" রামলক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করেছেন—"চতুর্ভুজও বলতে পারো। সাক্ষাৎ ভগবান! সকালে উঠেই মুখ দেখি, মন্দ কী! তারপর পুনশ্চ জোড় দিয়েছেন—হ্যাঁ, নেহাত মন্দ কী?"

ক্রমশ তারা বড় হল। ভায়ে-ভায়ে এমন মিল কদাচই দেখা যায়। পরস্পরের প্রতি প্রাণের টান তাদের এত প্রবল ছিল যে কেউ কাউকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারত না। তাদের এই অন্তরঙ্গতা যে-কেউ লক্ষ্য করেছে সে-ই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, এদের ঘনিষ্ঠতা বরাবর থাকবে, এদের ভালবাসা চিরদিনের। সকলেই বলছে যে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই একটা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু যেরকম ভাবগতিক দেখা যাচ্ছে তাতে এদের দু-ভায়ের মধ্যে কখনো ছাড়াছাড়ি হবে, দুঃস্বপ্নেও এমন আশঙ্কা করা যায় না। এদের আত্মীয়তা কোনদিন যাবার নয়, নাঃ! বাঙলা দেশে আদর্শ ভ্রাতৃত্বের জন্যে মেডেল দেবার ব্যবস্থা সে সময়ে থাকলে সে মেডেল যে ওদেরই কুক্ষিগত হত, একথা অকুতোভয়ে বলা যায়।

দুভায়ে একসঙ্গেই খেলা করত, একসঙ্গে বেড়াত, একসঙ্গে খেত, আঁচাত এবং ঘুমোত। অন্য সব লোকের সঙ্গ তারা একেবারেই পছন্দ করত না। সব সময়েই তারা কাছে কাছে থাকত, একজনকে ছেড়ে আরেকজন খুব বেশি দূরে যেত না। রামলক্ষণের গিন্নি তাদের এই সুগুণের কথা জানতেন, এই কারণে যদি-বা কখনো কেউ হারিয়ে যেত, স্বভাবতই তিনি একজনের খোঁজ করতেন,—তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল যে একজনকে যদি খুঁজে পান তাহলে আরেক জনকে অতি সন্নিকটেই পাবেন। এবং দেখা গেছে তাঁর ভুল হত না।

আরও বড় হলে রামলক্ষ্মণ ওদের গোরু দুইবার ভার দিলেন।

রামলক্ষ্মণের খাটাল ছিল। সেই খাটালে গোরুরা বসবাস করত, তাদের দুধ বেচে ওঝা মহাশয়ের জীবিকা নির্বাহ হত। রামভরত গোরু দুইত, শ্যামভারত তার পাশে দাঁড়িয়ে বাছুর সামলাতো—কিন্তু সবদিন সুবিধে হয়ে উঠত না। এক-একদিন দুরন্ত বাছুরটা অকারণ পুলকে লাফাতে শুরু করত। শ্যামভরতকে তার সঙ্গে লাফাতে হত, তখন রামভরতের না লাফিয়ে পরিত্রাণ ছিল না। রামভারতের হাতে দুধের বালতিও লাফাতে ছাড়ত না এবং দুধের অধঃপতন দেখে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রামলক্ষ্মণ স্বয়ং লাফাতেন।

এত লাফালাফি সহ্য করতে না পেরে রামলক্ষ্মণের গিন্নি একদিন বলেই ফেললেন, "দুধের বাছা, ওরা কি দুধ দুইতে পারে?"

রামলক্ষ্মণ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, "নাঃ, কিছু হবে না ওদের দিয়ে! ইস্কুলেই দেব ওদের, হ্যাঁ!"

ইস্কুলের নামে দু-ভায়ের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

একদিন তো বাছুরটা শ্যামভরতকে টেনে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। রামভরতকে তখন দুধ দোয়া স্থগিত রেখে, অগত্যা বাছুর এবং ভায়ের সঙ্গে দৌড়তে হল।

রামলক্ষ্মণ সেদিন স্পষ্টই বলে দিলেন, "না, তোরা আর মানুষ হবি না! যা, তবে ইস্কুলেই যা তাহলে!"

ইস্কুলে গিয়ে দু-ভায়ের অবস্থা আরো সঙিন হল। একসঙ্গে ইস্কুলে যায় ইস্কুল থেকে আসে। কিন্তু সে কথা বলছি না। মুস্কিল হল এই, এক ভাই লেট করলে আরেক ভায়ের লেট হয়ে যায়। সেই অপরাধের সাজা দিতে এক ভাইকে কনফাইন করলে আরেক ভাই তাকে ফেলে বাড়ি চলে আসতে পারে না, তাকেও আটক থাকতে হয়। বিনা দোষেই। একজন যদি পড়া না পারে এবং তাকে মাস্টারমশাই বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেন, তখন অন্য ভাইকেও, নিখুঁত ভাবে পড়া দেওয়া সত্ত্বেও

সেইসঙ্গে বেঞ্চে দাঁড়াতে হয়। সবচেয়ে হাঙ্গাম বাধল সেইদিন যেদিন দুজনের কেউই পড়া পারল না আর মাস্টার বললেন একজনকে বেঞ্চে দাঁড়াতে, আরেকজনকে মেঝেতে নিলডাউন হতে। মাস্টারের হুকুম পালন করতে দুজনেই প্রাণপণ চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। 'ধুত্তোর' বলে সেই যে ইস্কুল তারা ছাড়ল—ওমুখোই হল না আর।

বাড়িতে এসে বাবাকে বলল, "মানুষ হবার তো আশা ছিলই না, তুমিই বলে দিয়েছ। অমানুষ হবার চেষ্টা করলাম, তাও পারা গেল না।"

শ্যামভরতও ভায়ের কথায় সায় দিয়েছে, "অমানুষিক কাণ্ড আমাদের দ্বারা হবার নয়। নিলডাউন আর ব্রেঞ্চে দাঁড়ানো! দুটো একসঙ্গে আবার!"

তারপর থেকে রামলক্ষ্মণ ছেলেদের আশা একেবারেই ছেড়েছেন।

ওরা যখন যুবক হয়ে উঠল তখন ওদের মধ্যে এক-একটু গরমিলের সূত্রপাত দেখা গেল। রামভরত ভোরের দিকটায় ঘুমোতেই ভালবাসে। তার মতে সকালবেলার ঘুমটাই হচ্ছে সবচেয়ে উপাদেয়। কিন্তু শ্যামভারতের সেই সময়ে প্রাতর্ভ্রমণ না করলেই নয়। ভোরের হাওয়ায় নাকি গায়ের জোর বাড়ে। বাধ্য হয়ে আধো-ঘুমন্ত রামভরতকে ভায়ের সঙ্গে বেরুতে হয়।

মাইল-পাঁচেক হেঁটে হাওয়া খেয়ে শ্যামভারত ফেরে, ক্লান্ত রামভরত তখন শুতে পারলে বাঁচে। ঘুমোতে ঘুমোতে ভায়ের সঙ্গে বেরিয়েছে সেই কখন, আর দৌড়তে দৌড়তে বিরল এই এখন—এরকম অবস্থায় কার না গা জড়িয়ে আসে, কে না গড়াতে চায়? কিন্তু শ্যামভরত তখন-তখনই আদা-ছোলা চিবিয়ে ডন-বৈঠক করতে লাগবে—কাজেই রামভারতের আর গড়ানো হয় না, তাকেও ভাইয়ের সঙ্গে ওঠবোস করতে হয়।

ব্যায়াম সেরেই শ্যামভরত স্নান সারবে। রামভারত বিছানার দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করে তেল মাখতে বসে—কী করবে? স্নান সেরেই শ্যামভারতের রুটির থালার সামনে বসা চাই—সমস্ত রুটিন-বাঁধা। ব্যায়াম করেছে, ভোরে হেঁটেছে—তার চোঁ-চোঁ খিদে। বেচারা রামভরতের রাত্রে ঘুম হয়নি, ভোরেও তাকে জাগতে হয়েছে, দারুণ হাঁটাহাঁটি। তারপর ফিরে এসেই ভায়ের সঙ্গে ওঠবোস করার পরিশ্রম। জিরোবার সময় এক মুহূর্ত পায়নি—গরহজম হয়ে এখন তার চোঁয়া ঢেঁকুর উঠছে।

সে বলেছে, "এখন খিদে নেই, পরে খাবো।"

ভাই ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, "পরে আবার খাবি কখন? পরে আমার আবার কখন সময় হবে? আমার কি আর অন্য কাজ নেই?"

সে জবাব দিয়েছে, "আমার খিদে নেই এখন।"

শ্যামভরত চটে গেছে, "খিদে নেই, কেবল খিদে নেই! কেন যে খিদে হয় না আমি তো বুঝি না! কেন, তুমিও তো ব্যায়াম করেছ বাপু! তবে? খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি, আর তোমার খিদে নেই—এ কেমন কথা?"

কাজেই রামভরতকে গরহজমের উপরেই আবার গলাধঃকরণ করতে হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে, প্রথম সুযোগেই রামভরত ভাইকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। "এবার একটু শুলে হয় না?"

"শোয়া আর শোয়া! দিনরাত কেবল শোয়া! কী বিছানাই চিনেছ বাবা!" শ্যামভরত গম্ভীরভাবেই ছিপ হাতে নেয়।

"এই দুপুর রোদে দারুণ গরমে তুমি মাছ ধরতে যাবে?" রামভরত ভীত হয়ে ওঠে।

"যাবই তো!" শ্যামভারত বলে, "কেবল শুয়ে শুয়ে হাড় ঝরঝরে হবার জোগাড় হল! তোমার ইচ্ছে হয় তুমি পড়ে পড়ে ঘুমোও, আমি মাছ ধরতে চললুম।"

শ্যামভরতের গায়ে জোর বেশি, টানও প্রবল। কাজেই কিছু পরেই দেখা যায়, শ্যামভরত মাছ ধরছে আর রামভরতকে তার কাছে চুপটি করে বসে থাকতে হয়েছে।

বেলা গড়িয়ে আসছে, এক ভাই মাছ ধরে, আরেক ভাই পাশে বসে ঢুলতে থাকে।

এইভাবে দু-ভাই ক্রমশ আরো বড় হয়ে উঠে।

একদা বাপ রামলক্ষ্মণ বললেন, "বড় হয়েছিস, এবার একটা কাজকর্মের চেষ্টা ত্যাখ্। বসে বসে খাওয়া কি ভালো?"

বসে-বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, শুয়ে শুয়ে, কিম্বা দৌড়তে দৌড়তে কী ভাবে খাওয়াটা সবচেয়ে ভালো সে সম্বন্ধে জোড়াভরত কোনদিন ভাবেনি, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাপের কথা মেনে নিয়েই চাকরির খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়ল।

গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা দেখে একজন ভদ্রলোক শ্যামভরতকে দারোয়ানি কাজে বহাল করলেন। কিন্তু রামভরতকে কাজ দিতে তিনি নারাজ। শ্যামভরত দিনরাত পাহারা দেয়, রামভরতও ভায়ের সঙ্গে গেটে বসে থাকে।

ভদ্রলোক শ্যামভরতের খোরাকি দেন। রামভরতকে কেন দেবেন? রামভরত তো তাঁর কোনো কাজ করে না। সে যে গায়ে পড়ে, উপরন্তু তাঁর বাড়ি পাহারা দিয়ে দারোয়ানির কাজে বিনে পয়সায় অমনি পোক্ত হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে যে তিনি কিছু চার্জ করেন না এই যথেষ্ট।

তিন দিন না খেয়ে থেকে রামভরত মরিয়া হয়ে উঠল, বললে, "আমি তাহলে গাড়োয়ানিই করব।"

এই না বলে একজন গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে, কেবল খাওয়া-পরার চুক্তিতে অ্যাপ্রেনটিস নিযুক্ত হয়ে গেল।

এর পর রামভরত গাড়োয়ানি করতে যায়। শ্যামভরতকেও

ভায়ের সঙ্গে যেতে হয়। উন্মুক্ত সদর দ্বার বিনা রক্ষণাবেক্ষণে পড়ে থাকে। কোনদিন বা শ্যামভরত দরজা কামড়ে পড়ে, সেদিন আর রামভরতের গাড়োয়ানিতে যাওয়া হয় না।

অবশেষে একদিন এক কাণ্ড হয়ে গেল। ক্ষুধাতুর রামভরত থাকতে না পেরে বাবুর বাগানের এককাঁদি মর্তমান কলা চুরি করে বসিয়ে দিল। শ্যামভরত ভাইকে বারণ করেছিল, কিন্তু ফল হয়নি। তখন থেকে শ্যামভরতের মনে বিবেকের দংশন শুরু হয়ে গেছে।

কর্তা তাকে পাহারা দেবার কাজে বাহাল করেছেন। চুরি চামারি যাতে না হয় তাই দেখাই তো তার কর্তব্য। কিন্তু এ চুরি যে কেবল তার চোখের সামনেই হয়েছে তা নয়, সে এতে বাধা দেয় নি, দিতে পারে নি; এমনকি একরকম প্রশ্রয়ই দিয়েছে বলতে গেলে। তার কি এতে কর্তব্যের ত্রুটি হয়নি? এ কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? কে বড়? ভাই, না মর্তমান কলা?

অবশেষে আর থাকতে না পেরে, শ্যামভরত চুরির কথাটা কর্তার কাছে বলেছে। কর্তা হুকুম দিয়েছেন, "চোরকো পাকড় লেয়াও!"

চোর পাকড়ানো অবস্থাতেই ছিল, সুতরাং তাকে ধরতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। কর্তা তৎক্ষণাৎ রামভরতকে শ্যামভরতের সাহায্যে থানায় ধরে নিয়ে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছেন।

সাতদিন ধরে বারাসতের আদালতে এই চুরির বিচার চলেছিল। রামভরত আসামী, শ্যামভরত সাক্ষী। রামভরত আসামীর কাঠগড়ায়, তার হাতে হাতকড়া—শ্যামভরত ভায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। আবার শ্যামভরত যখন জবানবন্দি দেয় তখন রামভরতকে ভায়ের সঙ্গে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসতে হয়।

অবশেষে রামভরতের এক মাস জেলের হুকুম দিলেন হাকিম। রামভরতকে জেলে নিয়ে গেল, কিন্তু শ্যামভরতকেও সেইসঙ্গে

নিয়ে যেতে হয়। অথচ শ্যামভরতের জেল হয় নি। মহা মুস্কিল ব্যাপার। নির্দোষের অকারণ সাজা হতে পারে না। অগত্যা রামভরতকে জেল থেকে খালাস দিতে হল।

খালাস পাওয়া-মাত্র রামভরত বলা নেই কওয়া নেই, ভাইকে ঠ্যাঙাতে শুরু করে দেয়। তাদের জীবনে এই প্রথম ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব। শ্যাম রামকে ঘুসি মেরে ফেলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও গিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে। তারপর দুজনে জড়াজড়ি, হুটোপাটি, তুমুল কাণ্ড।

রাস্তার লোকেরা মাঝে পড়ে বাধা দেয়। দুজনকে আলাদা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু আলাদা করতে পারে না। অল্পক্ষণেই বুঝতে পারে, দুজনকে তফাত করা তাদের ক্ষমতার অসাধ্য। কাজেই তাদের ছেড়ে দেয় পরস্পরের হাতে। তারাও মনের সুখে মারামারি করে। অবশেষে দুজনেই জখম হয়, তখন একই স্ট্রেচারে দুজনকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতাল থেকে ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে ছেড়ে দেবার পর দুজনে বেরিয়ে আসে। পাশাপাশি চলে, কিন্তু কেউ একটি কথা বলে না। রামভরত গুরুগম্ভীর, শ্যামভরত ভারি বিষণ্ণ। রামভরত আস্তে আস্তে হাঁটে, মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মোছে। শ্যামভরত থেকে-থেকে ঘাড় চুলকোয়। সেই ফাঁকে আড়চোখে ভায়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করে।

দু-ভাই চুপ করে চলে।

অবশেষে রামভরত আফিমের দোকানের সামনে এসে পৌঁছয়। একটা টাকা ফেলে দেয় দোকানে। একভরি আফিম কেনে, কিনেই মুখে পুরে দেয় তৎক্ষণাৎ।

শ্যামভরত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, রামভরত কিন্তু উদাসীন। শ্যামভরত মাথা চাবড়ায়, রামভরত এক ঘটি জল খায়। শ্যামভরত চায় ভাইকে নিয়ে তখুনি আবার হাসপাতালের দিকে ছুটতে। রামভরত কিন্তু গির্দা ঠেস দিয়ে একটা খাটিয়ায় বসে পড়ে।

শ্যামভরত তখন কেঁদে ফেলে, বলে, "এ কী করলি ভাইয়া!"

রামভরত ভারি গলায় জবাব দেয়, "কলা খেলে আফিম খেতে হয়।"

"আচ্ছা এবার তুই যত খুশি কলা খাস, আমি আর বলব না।" শ্যামভরত লুটিয়ে পড়তে চায় মাটিতে।

রামভরত গম্ভীর হয়ে উঠে, "আফিম খেলে আর কলা খেতে হয় না।"

এই কথা বলে সে খাটিয়ার ওপর সটান হয়।

রামভরত মারা যায়; আর শ্যামভরত?

শ্যামভরতকে যেতে হয় সহমরণে।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

এই সিরিজে

বুদ্ধদেব বসু ● বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ● আশাপূর্ণা দেবী ● কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ● শিবরাম চক্রবর্তী ● সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ● প্রেমেন্দ্র মিত্র ● রবীন্দ্রলাল রায় ● অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ● জরাসন্ধ ● বনফুল ● তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ● শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ● মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুকুমার দে সরকার ● হেমেন্দ্রকুমার রায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প।

প্রতি বই দু-টাকা।